বিপ্লবী বাংলা

বিপ্লবীপরিষদের মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৩তীয় বর্ষ ৪৪ সংখ্যা ১৭ই আগষ্ট ১৯৭৪ শনিবার ৩১শে শ্রাবণ ১৩৮১ প্রতি সংখ্যা ২৫ প.

নূতন ভারত যারা সৃষ্টি করতে চায়, তাদের কেবল দিয়ে যেতে হবে—সারা জীবন কেবল দিয়ে যেতে হবে—নিজেকে বিলিয়ে কাঙ্গাল হয়ে যেতে হবে—প্রতিদানে কিছু না চেয়ে। —নেতাজী

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতা দিবস

আজ স্বাধীনতার অষ্টবিংশতি বর্ষের প্রারম্ভ মুহূর্তে সর্বাগ্রে স্মরণ করি জাতির রাষ্ট্রীয় স্বাধীন অস্তিত্বকে যাহার মূল্যায়ণ করা যায় না আমাদের সম্পদ সৌভাগ্যের পরিমাপে অথবা, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ দৈন্য চিন্তা অতৃপ্ত আকাঙ্খার হিসাব নিকাশের মাধ্যমে। সপ্তবিংশতি বৎসরের অন্তে যদি আমরা সত্যই অনুভব করি যে, জাতির রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আনুকূল্যে যে সৌভাগ্য সম্পদ আমরা আশা করিয়াছিলাম, দৈন্য দারিদ্র হইতে যে মুক্তির আকাঙ্খা আমাদের মনে জাগ্রত হইয়াছিল তাহা অপূর্ণ রহিয়াছে, তবে সবিনয়ে এই কথাই স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের যোগ্যতা, কর্মশক্তি ও আত্মোৎসর্গের অনিচ্ছা আমাদের আশা আকাঙ্খাকে প্রতারিত করিয়াছে। পূর্ব্বপুরুষীগণ যে আত্মবিলিয়নের আদর্শ নিষ্ঠার মূল্যে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, উত্তর কালে, আমরা আমাদের জাতীয় চরিত্রে সে আদর্শনিষ্ঠা রক্ষা করিতে পারি নাই—আমরা আমাদের পূর্ব্বসূরীদের বর্ণ বিচারে জাতিচ্যুত হইয়াছি। দোষ স্বাধীনতার নয়—দোষ আমাদেরই।

স্মরণ করি সেই সকল অগণিত শহীদকে এবং আত্মত্যাগী আদর্শনিষ্ঠ কর্মী ও চিন্তা নায়কদের যাহারা তাঁহাদের শতবর্ষব্যাপী সাধনার মধ্য দিয়া দেশবাসীর সম্মুখে এমনি এক অমলিন আদর্শের ঐতিহ্য রাখিয়া গিয়াছেন যাহা এক অবিস্মরণীয় জীবন্ত সত্তা লইয়া আজও আমাদের সম্পদে, বিপদে এবং দুঃখে দৈন্যে মুক্তি পথের ইঙ্গিত দিতেছে।

স্মরণ করি, ভারতীয় বিপ্লবের ঋষি অরবিন্দকে, মহাকালের চক্রান্তে অথবা তাহার ন্যায় নিষ্ঠ পক্ষপাতিত্বের অনুকূলতায় যাহার পূণ্য জন্মদিন ও ভারতীয় স্বাধীনতার পবিত্র জন্মলগ্ন একসঙ্গে মিলিত হইয়া আছে। স্মৃতির ফলকে ভাসিয়া উঠিতেছে সুদূর অতীত ইতিহাসের আর একটি দিনের কথা—১৮৯৩ সালের ২১শে আগষ্ট—যেদিন ঋষি অরবিন্দ তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের শুভ প্রারম্ভ মুহূর্তে। সেদিনের অর্দ্ধ জাগ্রত জাতিকে বিশ্বাস করিতে বলিয়াছিলেন—"Our actual enemy is not any exterior force to ourselves, but our own crying weakness, our cowardice, our selfishness, our hypocrisy, our purblind sentimentalism"। শত্রু আমাদের বাহিরে নয়—শত্রু আমাদের নিজেদের অন্তরের দুর্ব্বলতা ও আত্মপ্রবঞ্চনার মোহ মুগ্ধতায়। এই মহাসত্য আজও স্মরণীয় হইয়া আছে।

পুণ্যস্মৃতিতে পবিত্র এই আগষ্ট মাস। স্মরণ করি, শহীদ ক্ষুদীরাম বসুকে, যিনি ১৯০৮ সালের ১১ আগষ্ট মজঃফরপুর জেলে ফাঁসীর মঞ্চে আত্মদান করিয়া, জাতির সেবায় আত্মোৎসর্গের পবিত্র এক মঙ্গল কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। পিতৃমাতৃহীন ক্ষুদিরাম উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীতে পাঠকালে সে যুগের স্বদেশী আন্দোলনের তরঙ্গ স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন

মেদিনীপুরের জাতীয় বিদ্যালয়ে। শুনিয়াছিলেন স্বাবলম্বী প্রচেষ্টায় জাতির খাদ্য ও বস্ত্রের অভাব মিটাইতে হইবে সর্ব্বাগ্রে। জাতীয় বিদ্যালয়ে তাঁতবস্ত্র শিল্প শিক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন যখন সেই সময় ইংরেজের চর তাঁহাকে অনুসরণ করিতে আরম্ভ করে। ক্ষুদীরাম সহর ছাড়িয়া গ্রামে আসিলেন। পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ বালক পরিচয়ে এক কৃষক গৃহস্থের গৃহে আশ্রয় লাভ করিয়া চাষবাস শিক্ষার কার্য্যে মনযোগ দিলেন, দেশের খাদ্যাভাব মিটাইবার ক্ষেত্রে সহায়তা করিবার সঙ্কল্প লইয়া। অল্প দিনের মধ্যেই মাতৃস্বভাবা কৃষক পত্নী বুঝিতে পারিলেন যে ক্ষুদীরাম চাষী গৃহস্থ ঘরের ছেলে নয়—নিশ্চয়ই কোন সচ্ছল ভদ্রঘরের সন্তান হইবে। অতএব ক্ষুদীরামের প্রতি মাতৃস্থানীয়া চাষী পত্নীর আদর যত্ন বৃদ্ধি পাইল। ক্ষুদীরাম একদিন চাষী পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'মা' তুমি সারাদিন মেহনৎ কর—বাবা উদয়াস্ত ক্ষেতে খামারে কাজ করেন, অথচ ভাল জিনিসটি আমাকেই খাইতে দিতেছ, ভাল বিছানায় আমাদেরই শুইতে দিতেছ—এমন হইবে কেন।' কৃষক পত্নী হাসিয়া উত্তর দিলেন—'তোমার বাবা নাই মাও নাই, তাই জান না যে বাপ মা নিজেরা না খাইয়া ছেলেকে খাওয়ায় —ছেলে মেয়ের সুখে সুখী হয়।' ইহার উপর আর কথা চলে না।

সেই ক্ষুদীরামকে প্রাণদণ্ডাদেশ দিয়া বিচারক যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে তাঁহার কোন শেষ ইচ্ছা এবং শেষ বক্তব্য আছে কিনা,—ক্ষুদীরাম অকুতোভয়ে জবাব দিয়াছিলেন যে, তিনি অত্যন্ত মনযোগ দিয়া গীতা পাঠ করিয়াছেন। অতএব যাহা করিয়াছেন সমস্তই বুঝিয়া শুনিয়া, দেশের হিতসাধন কল্পে আত্মসমর্পিত মন ও বিবেক চালিত হইয়াই করিয়াছেন। নতুন কোন কথা তাঁহার বলিবার নাই। একটি মাত্র শেষ সাধ আছে—শেষ বিদায়ের পূর্ব্বে একবার মেদিনীপুরের মাটি স্পর্শ করা—চক্ষু ভরিয়া মেদিনীপুরের উন্মুক্তনীল আকাশ দেখা।

"ঐটি আমার গ্রাম, আমার স্বর্গপুরী,
ঐ খানেতে হৃদয় আমার গেছে চুরি!'

সেদিনের বিদেশী শাসক ক্ষুদীরামের সেই শেষ ইচ্ছা পূরণ করে নাই। নাই বা করিল—কিন্তু, যে স্বদেশানুরাগ, যে দেশ প্রেম, যে আত্ম সমর্পিত জীবনাদর্শের তত্ত্বকথা বিধৃত রহিয়াছে ক্ষুদীরামের স্বল্প পরিসর জীবনে তাহা বুঝিতে হইলে কি বহু বিতর্কের প্রয়োজন আছে, বহু দেশ বিদেশ অন্বেষণ করিতে হয়!

ভারতীয় মুক্তি সংগ্রামের বিচিত্র ইতিহাসে সমৃদ্ধ ধন্য এই আগষ্ট মাস। ১৯৪৩ সালের ২৫ আগষ্ট সারা পৃথিবীর বায়ু তরঙ্গে ভাসিয়া আসিয়াছিল একটি যুগান্তকারী ঐতিহাসিক সুসংবাদ। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের স্বকণ্ঠ নিসৃত ঘোষণা আসিয়া পৌঁছিয়াছিল—'In the interest of Indian Independence Movement and of the Azad Hind Fouz I have taken over the direct command of our Army from this day." ১৯৪৪ সালের ১৪ই আগষ্ট, নেতাজী বেতার যোগে ঘোষণা করিয়া ছিলেন, "In the middle of March this year, advance units

[পরবর্তী ৪ পাতায় দেখুন]

শ্রীঅরবিন্দ 'জয় তব জয়'

শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিন ১৫ই আগস্ট তারিখেই ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছে। এটা আকস্মিক নয়, এটা-যেন একটি বিশেষ অর্থপূর্ণ ঘটনা। যে দিন "দেবতার দীপ হস্তে" রুদ্রদূতরূপে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল, সেই বিশেষ দিনটিতেই ভারতের স্বাধীনতা লাভ যেন তাঁর সারাজীবনের তপস্যালব্ধ পুরস্কার।

শ্রীঅরবিন্দের প্রতিভা ও মনীষা একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি। শ্রীঅরবিন্দের মত মানুষ সবসময় আসেন না। এরা একটি মিশন নিয়ে আবির্ভূত হন সন্ধি যুগের সন্ধিক্ষণে। এক একটা দেশ ও জাতি যখন সবদিক্ দিয়ে দিশেহারা হয়ে, অন্ধকার থেকে আলোকে যাওয়ার জন্য পরিত্রাহি ডাক ছাড়ে, তখন পরিত্রাতা হিসাবে এই তুরীয় লোকের আলোতে 'প্রাণের প্রদীপ' জ্বালিয়ে ধরায় আসেন। গুরুদেবের কথায় এঁদের সম্বন্ধে বলা যায় 'এঁরা সাধক, এঁরা প্রেমিক, এঁরা পাগল' 'অকূল সংসারে দুঃখ-আঘাত' এঁদের 'প্রাণে বাঁশী ঝঙ্কারে।' এঁরা অ-সাধারণ, এরা অচিন-পথের পথিক, এঁরা জীবনের পথ-পরিক্রমা করেন দুঃসাহসের টানে। শ্রীঅরবিন্দ এই রুদ্রদূতদের মধ্যে মধ্যমণি। শ্রীঅরবিন্দ শেওলার মধ্যে একটি প্রস্ফুটিত শতদল পদ্ম। তিনি ছিলেন মহৎ কর্মী, মহৎ দেশভক্ত, মহৎ দেশ নায়ক, মহৎ স্বপনী সবই সত্য। কিন্তু তাঁর মহত্তম রূপ হল "তাঁর অন্তরাত্মার অধ্যাত্ম জ্যোতি।" শ্রীঅরবিন্দ ভারতবর্ষের এক দারুণ দুর্দিনে এসেছিলেন ভারত মাতার বন্ধনদশা মোচন করে, তাকে অতীত গৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে। তিনি চেয়েছিলেন এবং তাঁর জীবন ব্যাপী সাধনাও ছিল, ভারতবর্ষ শুধু স্বাধীনতাই লাভ করবে না, ভারত বিশ্বের মানুষের আলোর দিশারী হয়ে পথ প্রদর্শক হবে। তাঁর চলার পথে বাধা ছিল ইংরেজের কঠিন শাসন রজ্জু। তাকে তিনি প্রথমেই অপসারিত করতে চেয়েছিলেন, নতুন আদর্শে, নতুন মানুষ গড়ে, বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। প্রকৃত পক্ষে ভারতবর্ষে বিপ্লব সাধনার কর্মক্ষেত্রে একটা সমগ্র পরিকল্পনা নিয়ে মুক্তি পথের নতুন দিগন্ত খুলে দেবার তিনিই ছিলেন প্রধান পথিকৃৎ। রূপার চামচ মুখে নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন। ছাত্র হিসাবে সে সময়ে সমগ্র পৃথিবীতে তার সমকক্ষ ছিল না প্রায় কেউ, একথা তাঁর একজন শিক্ষকের স্বীকৃতি। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সব সম্ভাবনাকে তৃণবৎ ত্যাগ করে দেশজননীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন তিনি যৌবনের প্রারম্ভেই। বস্তুজগতের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করার সুনিশ্চিত সম্ভবনাকে বিসর্জন দিয়ে, তিনি বেছে নিয়েছিলেন ত্যাগের পথ, দুঃখকষ্টের, দুঃসাহসের পথ, তাঁর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে ভারতবর্ষে সৈন্যদলে বিদ্রোহ ঘটিয়ে, সাধারণ মানুষকে সেই আন্দোলনের সামিল করার যে অসীম সাহসিক পরিকল্প তিনি গ্রহণ করেছিলেন সেই অন্ধকার যুগে, সেটাই হল তাঁর অসাধারণ মনীষার নিশ্চিত প্রমাণ। শ্রীঅরবিন্দ পরবর্তী কালে চারিদিকে বাসুদেবের অস্তিত্ব উপলব্ধি করে, পরে সাধনমার্গে সাধনায় নিমগ্ন হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবন প্রভাতেই সাধারণ মানুষের জন্য যে দরদ তাঁর মনের দিকচক্রবালে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল, তাদের কথা সাধনমগ্ন থাকার সময়েও তাঁর স্মরণ পথে উজ্জ্বল ছিল। সাধারণ

মানুষও যাতে তাঁর প্রদর্শিত পথের পথিক হয়ে, পরম প্রেয়কে, সর্ব্বশক্তিমানকে উপলব্ধি করতে পারে, এই ছিল তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। শুধু নিজের মুক্তি নয়, সকলের মুক্তিকে-জাগতিক ও আধ্যাত্মিক-ত্বরান্বিত ও বাস্তবায়িত করাই ছিল তাঁর সাধনার অঙ্গ। পৃথিবীতে যে সব পূর্বসূরীরা এই পথের পথিক ছিলেন, শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাদের পার্থক্য এই খানে, বৈশিষ্ট্য এই খানে, স্বকীয়তা এই খানে। তাই তিনি আজও সমগ্র জাতির নিকট স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন এবং থাকবেন।

[চতুর্থ পাতার শেষাংশ]

of the Azad Hind Fouz... ... crossed the Indo-Burma border and the fight for Indian liberation there upon commenced on Indian soil". সে সংগ্রাম শেষ হয় নাই। ১৯৪৫ সালের ১৭ই আগষ্ট ভারতীয় বিপ্লবের শেষ সিপাহ সালার বিমান যোগে ব্যাঙ্কক হইতে যাত্রা করিয়া ছিলেন এক অনির্দিষ্ট পথ যাত্রায়। আজ স্মরণ করি তাঁহার সেই অসমাপ্ত অভিযানকে।

সর্ব্বশেষ স্মরণ করি ঐতিহাসিক ডাণ্ডি অভিযানের সেই দুঃসাহসী আদর্শবাদী সেনাপতিকে যাহার 'ভারত ছাড়' আন্দোলন ইংরেজকে ভারত ছাড়িতে বাধ্য করিয়াছিল এবং যাহার সকল আদর্শকে নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিবার জন্যই যেন তাহারই দেশবাসী তাঁহাকে শহীদ লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছে।

বন্দে মাতরম্

অনুচ্চ ও সঙ্কীর্ণ আদর্শ, ক্ষুদ্র আশা, ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য, তুচ্ছ সাবধানতা ও ভীরুতা এবং অদূরদর্শী ও সাহস পরাঙ্মুখ নেতাদল—এ সকল হেও উপাদান কখনও জাতীয় শক্তি গড়িবার উপযুক্ত সামগ্রী হইতে পারে না। এরূপ ক্ষুদ্র উপাদান লইয়া কোন জাতি কোনও কালে মহত্বের উচ্চ-সোপানে উঠে নাই। "নিরিহো না আল্পতে মহৎ।" (যাহার আশা ক্ষুদ্র, সে কখনও মহত্ব ভোগ করে না)।

—শ্রী অরবিন্দ

★ ★

মানুষের অগ্রগতির মূল প্রেরণা হল মুক্তির আকাঙ্খা এবং সত্যের জন্য অনুসন্ধান। এই প্রেরণাতেই মানুষ নিত্য নতুন ভাবে তার ভাগ্য গড়ে তোলে।

—মানবেন্দ্র নাথ রায়

● ●

স্বদেশীয় ইতিহাসে যারা আলোক পায় না, তারা ভ্রষ্ট।

—ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

বিপ্লবী বাংলা

—পূর্ব্বানুবৃত্তি—

—বিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত

তারপরে আসুন আমাদের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ময়দানে। এটা কেউ বলেনা যে সবাইকেই একই ভাবে চিন্তা করতে হবে বা একভাবেই সমস্ত জিনিষকে দেখতে হবে। চিন্তার ক্ষেত্রে যেমন পার্থক্য থাকবে—কর্ম্মের ক্ষেত্রেও তেমনি পার্থক্য থাকবেই। লোকল্যাণ ক্ষেত্রে কল্যাণকামীদের ব্যক্তিগত সমষ্টিগত এবং সংস্থাগত আদর্শও কর্ম্মপথের মধ্যে পার্থক্য ও ব্যবধান থাকবেই—এবং সেটা একটা খুব গুরুতর কিছু নয়। কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষ বিশেষ করে বাংলার রাজনৈতিক ময়দানে যেটাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ করে তোলবার চেষ্টা হয়েছে সেটা তার বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষভাবে চিন্তা ও আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

রুশ দেশে বিপ্লব ও সাম্যবাদী গবর্মেণ্ট প্রতিষ্ঠার পরে স্বাভাবিক ভাবেই সেই দেশের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে মার্কস, লেনিন, ও সাম্যবাদ প্রভৃতি সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শোষিত শ্রেণীর মধ্যে একটা ভরসার স্পন্দন এবং শোষক গোষ্ঠীর মধ্যে একটা অস্বস্তির চাঞ্চল্য উদ্গত হয়। তারপর থেকে আজ পর্য্যন্ত দেশে দেশে জনপদে মানব সমষ্টির মধ্যে চিন্তাগত, তত্ত্বগত তথ্যগত বাস্তব ও ব্যবহারিক পরিস্থিতিতে বিরাট পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে এবং আরও বৃহৎ ও বৃহত্তর পরিবর্ত্তন হয়ে এবং হতে চলেছে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম এবং প্রকৃতির জগৎ থেকে সম্পদ ও শক্তি আহরণের ফলে যে সমস্ত পরিবর্ত্তন, সে সমস্ত পরিবর্ত্তনকে অতিক্রম করে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে মার্কসের সাম্যবাদের ভিত্তিতে এবং এই তত্ত্বকে কেন্দ্র করে যে পরিবর্ত্তন সেই পরিবর্ত্তনই বিশ্বমানবের সমষ্টিকে বেশী নাড়া দিল। দেশ কাল পাত্র ভেদে মার্কসবাদ, ষ্টেলিনবাদ এবং পরিশেষে মার্কসবাদ লেনিনবাদ স্থায়ী বা অস্থায়ীরূপে পরিগৃহীত ও প্রকটিত হতে লাগল।

মার্কসবাদ সাম্যবাদের দ্যোতক হলেও সাম্যবাদ কিন্তু একমাত্র মার্কসবাদের দ্যোতক নয়। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই পার্থক্যটি বিশেষ ভাবে অনুধাবন যোগ্য। কারণ ভারতবর্ষে মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বহু সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বেও যে আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক সর্ব্বাঙীন সাম্যবোধের উপলব্ধি ও আচরণ ভারতবর্ষের মূলভিত্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত তার গভীরত্ব ও ব্যাপকত্ব আজ পর্য্যন্তও কোন সমীক্ষার অপেক্ষা রাখে না। সে জন্যই ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বা ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে সাম্যবাদ বলতেই একমাত্র মার্কসবাদই বোঝায় না বলে আমি মনে করি। এবং সেই জন্যই এই দুটি শব্দ আমি পৃথকভাবে ব্যবহার করাটাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেছি।

ভারতবর্ষে ১৯৪৭ পর্য্যন্ত প্রাক্ স্বাধীনতা যুগ এবং তার পরে স্বাধীনোত্তর যুগ চলেছে। এই ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে মার্কসবাদকে তার বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও রূপ নিয়ে প্রাক স্বাধীনতা যুগেই এখানে কার্য্যকরী রূপ দেবার চেষ্টা হয়েছে এবং বিশেষ করে শিক্ষিত যুবক যুবতীদের মধ্যে এর আকর্ষণ যথেষ্ট ও সমধিক ছিল। তবে পরাধীনতার বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রাম যে পর্য্যায় এসে চলছিল তাতে অন্য কোন বিষয় তা যতই গুরুত্বপূর্ণ হোকনা কেন আমাদের দেশের চিন্তাজগতে বিশেষ আলোড়ন উপস্থিত করতে পারেনি। এর গতি সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে রাশিয়ার বিপ্লব যথেষ্ট প্রেরণা দিলেও মার্কসবাদ কোন গতি সৃষ্টি করতে পারে নাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রুশিয়ার অপূর্ব সংগ্রাম বহুক্ষেত্রে আমাদের ব্যাপকভাবে প্রেরণার অন্যতম উৎস

হলেও মার্কসবাদ এখানে স্থপা ছিলনা। তারপরে রাশিয়ার গতি অনুসরণ করে ভারতের কমুনিষ্ট পার্টির যে স্বাধীনতা-সংগ্রাম বিরোধী জনযুদ্ধের নীতি—সেটা তাদের বিরুদ্ধে এবং কমুনিজমের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল।

মার্কসবাদের ভিত্তিতে কমুনিষ্টদের দল ও কার্যক্রম স্বাধীনোত্তর ভারতেই বেশী প্রসার লাভ করে—এবং তার পরের ইতিহাস কোন ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখেনা পুনরাবৃত্তিরতো নয়ই। কংগ্রেস ও কংগ্রেসের শাসন ও পদক্ষেপ যতই জনসাধারণের মধ্যে বিরূপতা ও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করতে লাগল ততই কমুনিষ্ট দল তাদের মধ্যে নিজেদের প্রসারের অনুকূল ক্ষেত্র পেতে লাগল। বস্তুতঃ কংগ্রেসের অপচার জনক্ষেত্রে কমুনিষ্ট পন্থীদের উপচারে পরিণত হয়ে যে অবস্থার সৃষ্টি করল তাতে দেখা গেল গোটা ভারতে ঠিক কংগ্রেসের মোকাবিলা না করতে পারলেও ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কমুনিষ্ট পার্টি কংগ্রেসের পরেই নিজের স্থান অধিকার করে নিয়েছিল। তবে কমুনিষ্টদের সে রকম কোন যোগ্য নেতৃত্বের উদ্ভব হয় নাই যে নেতৃত্ব গান্ধী পরবর্তী জহরলালের নেতৃত্বের কোন গুরুত্বপূর্ণ মোকাবিলা করতে পারে। কংগ্রেসের কাম্য ক্ষমতা লাভ ও ক্ষমতালাভের জন্য নির্বাচনে পর্যবসিত হয়েছিল কমুনিষ্টদের গতিপথও ক্রমে ক্রমে মুখ্যতঃ নির্বাচনমুখী হয়ে পরিণত হল। ফলে কংগ্রেসের তথা কংগ্রেসী ক্ষমতা ঔদ্ধত্য ও বিপথগামীতার সুযোগ নিয়ে জনক্ষেত্রে বিরুদ্ধতা বা বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা প্রকৃত শক্তির পরীক্ষার ক্ষেত্র ভোটের বাক্সেই স্থানান্তরিত হল। এখানে দেশ কাল পাত্র ভেদে কোথাও আংশিক হয়েছিল।

ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে এই দুটি শক্তির ঘোষণার মধ্যে একটি বিষয় বিশেষ লক্ষণীয়। জহর লালের নেতৃত্বে কংগ্রেস ঘোষণা করেছিল তার লক্ষ্য সমাজতন্ত্রী কাঠামো বা ধাঁচা যাই বলা হোক না কেন। আর কমুনিষ্ট পার্টিতো প্রতিষ্ঠিত মার্ক্সবাদের ভিত্তিতে। বিশেষ করে ভারতীয় কমুনিষ্ট পার্টির এ বিষয়ে কোন ভেজাল ছিলনা। রুশ সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র। কংগ্রেসের ঘোষিত সমাজতন্ত্রী কাঠামোর এ পর্যন্ত কোন পরিষ্কার ভাবে ব্যাখ্যা করা হয় নাই। কিন্তু এটা ঠিকই যে যে ভাবেই সমাজতন্ত্রকে আবাহন করা যাক না কেন—তার মূল ভিত্তি থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে তার কোন রূপ দেওয়া যায় না। জহর লালের নেতৃত্ব বা কংগ্রেসের গতি তাদের সমাজতন্ত্রী কাঠামোতে মার্ক্সবাদের কোন কিছু অংশতঃও স্বীকার করে নাই। আর এক দিকে কোন ভারতীয় ভাবনা দ্বারাও তাদের রাষ্ট্র রচনার উদ্যোগ প্রাণবন্ত হয় নাই। ভারতবর্ষের অকমুনিষ্ট বুদ্ধি জীবিরা ভারতের রচনায় তার রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার ব্যাপারে ইউরোপ মার্কিণ শিক্ষা, চিন্তা, ব্যবস্থা ও দৃষ্টি ভঙ্গীকেই শ্রেষ্ঠ হিসাবে নিয়ে তারই ভিত্তিতে ভারতের রাষ্ট্র কাঠামো রচনায় উদ্যোগী হয়েছেন ও রয়েছেন।

কমুনিষ্টরা ভারতবর্ষে মার্কসবাদের রুশীয় সংস্করণকেই ভারতীয় শোষিত জনগণের মুক্তির একমাত্র উপায় বলে কার্যকরী করার প্রচেষ্টা করেন আর অকমুনিষ্টরা বিশেষ করে যে সমস্ত বুদ্ধিজীবিরা কংগ্রেসের রাষ্ট্র রচনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তারা কি অর্থনীতি কি শিক্ষানীতিকে রাজনীতি সমস্ত বিষয়েই একমাত্র মার্কিনী ও ইউরোপীয় সংস্করণই গণতন্ত্রের পথে ভারতীয় জনতার মোক্ষের উপায় বলে ব্যবস্থা করে চলেছেন। ভারতের শোষিত জনগণের মুক্তির জন্য এবং গণতান্ত্রিক ভারতের মোক্ষের জন্য আরও যে সমস্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ দল বা গোষ্ঠী গঠিত ও সক্রিয় তারাও ভারতবর্ষ এবং ভারতের নিজস্বকিছু বিবেচনার বা প্রয়োগের যোগ্য আছে একথা স্বীকার করেন না।

মার্কস একদা বলেছিলেন যে—**Man makes his own history but he maks it in accordance with conditions of his environment.**

ভারতের স্বাধীনতার চিন্তায় পরিষ্কৃৎ শ্রীঅরবিন্দ সেই ১৯০৮ সালে স্বাধীন ভারতের রূপরেখা সম্বন্ধে তার চিন্তা প্রকাশ করে প্রথমেই বলেছিলেন **India must not be an intellectual province of Europe.**

স্বাধীন ভারতে যারা শোষিত জনগণের মুক্তি ও জাতীয় ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক মোক্ষ চান তারা উভয়েই একই ভাবে এই ভারতবর্ষে মার্কস ও শ্রীঅরবিন্দ উভয়ের উপলব্ধ সত্যকে অস্বীকার করে চলেছেন।

(ক্রমশঃ)

বিপ্লবী ভারত শহীদনামা

(নবম স্তবক)

অগ্নি যুগের সিংহ দ্বাদশ—৮৭

পদধ্বনী

—ঃটাক্ষ,

পুলিন বিহারী দাস সম্পর্কে মিত্তির সাহেব সত্য সত্যই মারাত্মক ভুল করেছিলেন। সংস্কৃত ঘেঁষা বিশুদ্ধ বাংলায় যাকে "বলে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি, পুলিন বিহারী লোকটি ছিলেন বস্তুত সেই রকম। দৈহিক গঠনে খর্বাকৃতি, পরিধানে অপেক্ষাকৃত জীর্ণ ও মলিন বসন এবং বাক্‌চাতুর্যে কিছুটা নিরীহ স্বভাবের দেখে মিত্তির সাহেব যাকে প্রথমে একেবারেই আমল দিতে চাননি অথচ পরে উপস্থিত জনমতের চাপেই 'নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও' যাকে অনুশীলন সমিতির পূর্ববঙ্গ শাখার পরিচালক নিযুক্ত করতে বাধ্য হয়েছিলেন সে লোকটির অসামান্য কর্মোদ্যম ও অদ্ভুত সংগঠন প্রতিভা দেখে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রমথ মিত্র, মিত্রের কাছে নিজে লজ্জিতই বোধ করেছিলেন। ক্রমে কাজের মধ্য দিয়ে এই ব্যক্তিটির সত্য পরিচয় অর্থাৎ, আচ্ছাদনের অন্তরালবর্তী আসল মানুষটি যখন আত্মপ্রকাশ করতে লাগলো তখন তাঁর নিজের নামের বেশভূষাও খসে পড়তে আরম্ভ করলো। নামের চিরাচরিত সংস্কার গত আদ্যাক্ষর 'শ্রী' লোপ পেল, পিতৃদত্ত নামের তিনটি শব্দের মধ্যবর্তী 'বিহারী' শব্দটি যে কখন উপে গেল সেকথা বোধ হয় তখন কেউ খেয়াল করে দেখেওনি। সেদিনের বাংলার অনাড়ম্বর বিপ্লব সাধনার শ্রীহীন অঙ্গন তলে নাম পরিচয়ের আতিশয্য বর্জিত যে লোকটি এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁকে সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত লোকে জেনে আসছে শুধু আটপৌরে 'পুলিন দাস' বলে। ভিতরের আগুন যখন প্রকাশ পেল তখন প্রলেপ যেটুকু ছিল তা উড়ে গেল অতি সহজ ভাবে। অতি নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় যে, 'শ্রীপুলিন বিহারী দাস' বলে উল্লেখ করলে যে লোকটিকে স্মৃতিপথে সমাকৃষ্ট করতে অনেকেই হঠাৎ থতমত খেয়ে যাবে, শুধু 'পুলিন দাস' বললে সেই লোকটিকে চিনতে তাদের মুহূর্ত বিলম্ব হবে না আজও। পুলিন দাস নামে দ্বিতীয় ব্যক্তির অস্তিত্ব যে থাকতে পারে সে কথা মনেই হবে না। বস্তুত পুলিন দাস ছিলেন এক এবং অদ্বিতীয়। মিত্তির সাহেবের বিলেতী ধোপ দেওয়া কলকাতার চোখে, পূর্ববঙ্গের খালে বিলে ধোয়া কাঁচা ও অনাদরে পাট করা ঐ মানুষটির মূল্য বুঝতে যদি কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়ে থাকে তবে, সত্যই তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। এমন হয়, হতে পারে, হয়েও থাকে হর হামেশা।

পুলিন বিহারী দাস
জন্ম : ২৪শে জানুয়ারী-১৮৭৭
মৃত্যু : ১৭ই আগষ্ট-১৯৪৯

ছয় মাস যেতে না যেতেই মিত্তির সাহেব তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছিলেন এবং তা যথারীতি সংশোধনের জন্য পুলিন বাবুকে ডেকে পাঠালেন কলকাতায় বিপ্লব কর্মে যথারীতি দীক্ষা দানের জন্য। দীক্ষা দান করেছিলেন, সমিতির মূল ও মুখ্য সভাপতি হিসেবে, প্রমথ মিত্র স্বয়ং। তারক দাসের

মারফৎ দীক্ষা গ্রহণের আহ্বান পেয়ে পুলিনবাবু কলকাতায় এসে অনুশীলন সমিতির প্রধান কার্য্যালয়ের পরিচালক সতীশ বসুর বাড়ীতে অতিথি হলেন। দীক্ষা দানের আনুষ্ঠানিক কাজ সম্পন্ন হয়েছিল ২০৯ নং লোয়ার সার্কুলার রোডে মিত্তির সাহেবের নিজের বাড়ীতে। এখন যেখানে 'অন্ধ বিদ্যালয়' আছে এই বাড়ীটি ছিল ওরই কাছে—প্রায় সংলগ্ন। দীক্ষা দানের প্রাসঙ্গিক পদ্ধতি সম্পর্কে পুলিনবাবু নিজে তাঁর জীবন স্মৃতিতে বলেছেন—'ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি সকল উপাচারে সাজাইয়া ছান্দোগ্যোপনিষদ হইতে বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিয়া পি, মিত্র যজ্ঞ সমাপন করিলেন। পরে আমি আলীঢ়াসনে বসিলাম, আমার মস্তকে গীতা স্থাপিত হইল, তাহার উপর অসি রাখিয়া উহা ধরিয়া পি. মিত্র আমার দক্ষিণে দণ্ডায়মান রহিলেন। আমি যজ্ঞাগ্নির সম্মুখে বসিয়া কাগজে লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ করিয়া প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইলাম। পরে সম্মুখস্থিত যজ্ঞাগ্নি ও পি, মিত্রকে নমস্কার করিলাম। ভগবান, অগ্নি, মাতা (মাতৃভূমি), গুরু এবং নেতাকে সম্মুখে রাখিয়া আমি এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, যথা সর্ব্বস্ব উপেক্ষা করিয়াও সমিতির উন্নতির জন্য সমস্ত আদেশ প্রতিপালন করিব, কাহারও নিকট কিছু প্রকাশ করিব না এবং সমিতির যাহারা বিরুদ্ধাচরণ করিবে তাহাদের যথোচিত শাস্তির ব্যবস্থা করিব। যদি এই প্রতিজ্ঞা পালনে বিমুখ হই, তাহা হইলে ব্রাহ্মণগণের, মাতার (মাতৃভূমির) ও সর্ব্বদেশের দেশভক্ত মহাপুরুষদের অভিসম্পাত আমাকে অচিরে ধ্বংস করিবে।

যথা নিয়মে দীক্ষা হয়ে যাবার পরেও পুলিন বাবু সে যাত্রায় আরো কয়েকদিন কলকাতায় ও চন্দন নগরে ছিলেন লাঠি, ছোরা খেলা সম্পর্কে অতিরিক্ত কিছু জ্ঞান আহরণের জন্য। এই সময় প্রমথ মিত্র মহাশয় পুলিন বাবুকে বলেছিলেন যে, অরবিন্দ ঘোষের কাছ থেকে তিনি জানতে পেরেছেন বালগঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে তিন শতাধিক মারাঠী যুবককে আমেরিকা থেকে যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়ে আনা হয়েছে এবং সমগ্র বোম্বাই প্রদেশে প্রায় দেড় লক্ষ সৈনিক বিপ্লব কর্ম্মের জন্য সংগৃহীত হয়েছে। অতএব বাংলা যাতে না এই ব্যাপারে পিছিয়ে থাকে সেজন্য ঢাকা জেলা থেকেই অন্ততঃ দশসহস্র যুবক যোদ্ধা সংগ্রহ করবার জন্য জরুরী কর্ম্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। জরুরী কর্ত্তব্য সম্পাদনের এই নির্দ্দেশ দানের সঙ্গে সঙ্গে সমিতির মূল সভাপতি হিসেবে পি, মিত্র মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গ শাখার সভাপতি আনন্দ চক্রবর্ত্তীর নামে একখানা চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে,—পুলিন বাবুকে সমিতির পূর্ব্ববঙ্গ সংগঠনের 'Executive Commander' নিযুক্ত করা হোল।

এই নিযুক্তিপত্র পাবার পর কিঞ্চিদধিক এক বৎসর কালের মধ্যে পুলিনবাবু যে অসামান্য সংগঠন প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে, 'রাউলাট কমিটি' নামে ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একটি তদন্ত কমিশন ১৯১৮ সালে যে গোপন রিপোর্ট পেশ করেছিলেন তাতে বলা হয়েছিল—

"...The Dacca Samiti was throughout the whole period the most powerful of these associations. The existence of this body alone, even if there had been no other, would have constituted a public danger. It was originally founded in Dacca by Pulin Behari Das, ostensibly as a society for physical and religious

culture. It took advantage of the bitterness which animated the Swadeshi movement and altruistic spirit (admirable so long as unperverted) shown by the bands of National Volunteers, who at that period used to hold themselves ready to assist at fires, floods and similar calamities. It penetrated the schools. The National School, Dacca, where Pulin and Bhupesh Chandra Roy were teachers, was one of the chief training and recruiting grounds of the Samiti'.

এই ন্যাশনাল স্কুলটিও কোন পুরানো স্কুল ছিল না। পুলিনবাবু Executive Commander পদে নিযুক্ত হয়ে কলকাতা ত্যাগ করবার আগেই ঢাকা থেকে খবর এসে পৌঁছেছিল যে, ছাত্রদের সম্পর্কে সরকারী একটি সারকুলারের প্রতিবাদে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্ররা সবাই একদিন নগ্নপদে স্কুলে যাবার জন্য প্রত্যেকের ছয়টাকা করে জরিমানা হয়েছিল এবং ফলে ছাত্ররা স্কুল বয়কট করেছে। সংবাদে আরও তথ্য ছিল এই যে, ঢাকা সমিতির সভাপতি অরবিন্দ চক্রবর্তী বিদ্যালয় ত্যাগী ছেলেদের পড়াশুনা চালিয়ে যাবার ব্যবস্থা হিসেবে ঢাকার তাঁতি বাজারে প্রতিষ্ঠীত সেকালের হোমিওপ্যাথী স্কুলের কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে সেই স্কুলেরই অবসর সময়ে ঢাকা ন্যাশনাল স্কুল নামে একটি বিদ্যালয় গড়ে তোলবার কাজ আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। উপরে উদ্ধৃত, রাউলাট কমিটির রিপোর্টের অংশ বিশেষে "admirable if not perverted" বলে যে কথাটা আছে সেই অনুসারে, ঢাকা সমিতি সম্ভবতঃ এই সময় থেকেই সরকারী কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় Perverted বা দূষিত হতে আরম্ভ করেছিল। আগুন নেভানো, মরা পোড়ানো ইত্যাদি নিয়েই যদি সমিতি ব্যস্ত থাকতো তবে সমিতির চরিত্র নিশ্চয়ই admirable" বলে গণ্য হতে থাকতো চিরকাল। ঢাকার ছাত্ররা সেটা হতে দিলনা, পুলিন বাবুও কলকাতা থেকে ফিরে ঐ স্কুলের শিক্ষকতা করতে সুরু করলেন। অতএব স্কুলটী তখন থেকেই সমিতির "recruiting ground" এ পরিণত হয়েছিল। অনতিকাল মধ্যেই স্কুলটী আবার কলকাতার সদ্য প্রতিষ্ঠিত "ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন" এর অনুমোদন লাভ করে সরকারী কর্তৃপক্ষের স্থায়ি কোপ দৃষ্টির আওতায় এসে গেল।

পূজারী ঠাকুর চোখ বুজে মন্ত্র পড়ে চলেছেন আর পুষ্পপাত্র থেকে ফুল নিয়ে বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করে এদিকে সেদিকে ছুঁড়ে ফেলছেন। ফুল কিন্তু পুষ্পার্ঘ্য হয়ে যথাস্থানে গিয়ে পৌঁছচ্ছে একেবারে নির্ভুল ভাবে—মন্ত্র নির্দ্দিষ্ট দেবতার চরণে। সাধারণ দর্শকদের কাছে এ বড় বিস্ময়কর ঘটনা—ভক্তিমান মানুষের কাছে এটা বিস্ময়ের চেয়ে ভক্তির জোর বলে গৃহীত হয়। কত ফুল বৃন্তের উপরেই শুকিয়ে ঝরে পড়ে আবার কত ফুল অভাজনের গলার মালা হয়ে শুকিয়ে যায়। কিন্তু ফুলের যোগ্যতা বিচার করে এই বিস্ময়কর তারতম্যের অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে না। সবাই সমস্বরে বলছে—আমি কারু চেয়ে ছোট নই—"যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" পুলিনবাবুর জীবনী আলোচনা করলে দেখা যাবে যে সত্যসত্যই এমনি একটি আত্ম নিবেদিত প্রতিশ্রুতি নিয়ে যেন তিনি জন্মেছিলেন। জন্মাবধি তিনি পেয়েছিলেন পরমাশ্চর্য্য অনুশীলনী সত্তা যা ততোধিক বিস্ময়কর যোগা-

যোগ ও কর্ম্মপ্রবাহের মধ্য দিয়ে তাঁকে সেদিনের প্রয়োজন পূরণ করবার যথাস্থানে নিযুক্ত করে দিয়েছিল। তিনি তাঁর জন্মার্জ্জিত অনুশীলনী সাধ্য সাধনা দিয়ে নিখুঁত ভাবে সে কর্ত্তব্য পালন করে গিয়েছেন সেদিন অনুশীলন সমিতির প্রয়োজন ছিল পুলিনবাবুর মতই একজন একনিষ্ঠ সেবকের যে পূর্ব্ববঙ্গকে গড়ে তুলবে বিপ্লবী ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট পীঠস্থান করে। সে কাজ তিনি করেছিলেন। রাউলাট কমিটি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল যে, "...a handful of East Bengal students made the British Govrnment almost impossible in India." এই মন্তব্যের মধ্যে যে ঐতিহাসিক যুগটি বিধৃত হয়ে আছে সে যুগটির গঠনকার্য্যে পূর্ব্বসূরী ছিলেন স্বনাম ধন্য অশ্বিনী কুমার এবং তার বৈপ্লবিক উত্তরসূরী হবার দায়িত্ব লাভ করেছিলেন পুলিন বিহারী। পুরোপুরি সাতটি দশক পরে আজও যদি যে কেহ গোটা পূর্ব্ববঙ্গ ঘুরে আসে তবে সেই বুঝতে পারবে যে, সে যুগে কেবলমাত্র প্রাকৃতিক ও ভৌগলিক বাধা অতিক্রম করে সেখানে অমন একটি দুর্দ্ধর্ষ বৈপ্লবিক শক্তি গড়ে তোলা কত দুঃসাধ্য ছিল! অথচ কিভাবে কতটুকু পুঁজি সম্বল করে যে পুলিনবাবু এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তার এক প্রান্তের ইতিহাস ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এখন তাঁর জীবনের পূর্ব্ব অধ্যায়টি কিঞ্চিৎ আলোচনা করলেই জানা যাবে যে, কি অপরিসীম অধ্যবসায় ও অমলিন অনুশীলনী নিষ্ঠা পুলিন বিহারীকে এই বিরাট দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা দান করেছিল। দেখা যাবে যে আত্ম সাধনালব্ধ কর্ম্মিষ্ঠতা ও যোগ্যতা নিয়েই তিনি যেন পূজারী ঠাকুরের নিবেদিত অর্ঘের মতই দেশ মাতৃকার চরণে এসে স্থিতি লাভ করেছিলেন। (ক্রমশঃ)

বিপ্লবী বাংলা

বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাপ্তাহিক মুখপত্র

জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত

॥ এই পত্রিকা ॥

—আপনি পড়ুন ও অন্য সবাইকে পড়ান—

প্রখ্যাত সাংবাদিক ফ্রাংক মোরেসের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

নিরস্ত্রতার যুগসন্ধিক্ষণে (পূর্বানুবৃত্তি)

—বীরেন দে—

চৈনিক নেতৃত্বের পশ্চাতে :

১৯৪৭ সালে ভারত দু'শ বৎসরের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন থেকে মুক্তি লাভ করল। তার পূর্বে ৮/৯ শতাব্দী ব্যাপী তার অর্থনীতি, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক যে কোন ক্ষেত্রেই ঘোরতর অনিশ্চয়তা বিরাজ করছিল। পাঠান, মোঘল, মারাঠা ও রাজপুতদের মধ্যে অবিরত দ্বন্দ্বের ফলে সামাজিক জীবনে বিরাট বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল। দেশের অভ্যন্তরে অনৈক্য হেতু সার্বভৌম দেশ হিসেবে তার কোন অস্তিত্বই ছিলনা। সুতরাং দেশের নিরাপত্তা বা বৈদেশিক নীতির কোন প্রশ্নই ওঠেনি। দেশে উন্নয়ন বা প্রগতি ছিল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। ইংরেজ শাসনের ফলে একটা ভৌগলিক ঐক্য সংস্থাপিত হলেও বহির্বিশ্ব ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সম্পর্ক বিষয়ে লণ্ডন মহানগরী থেকেই ইংরেজের স্বার্থ সংরক্ষিত প্রয়াস অক্ষুন্ন ছিল। সুতরাং তাদের অপসৃতির পর খণ্ডিত ভারতে হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গার অবস্থা। অপরদিকে যুরুপের অন্যান্য দেশগুলি এমন কি চীন, জাপানও আধুনিক রাজনীতি ক্ষেত্রে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গিয়েছে।

দেশ বিভাগের পর ভারতের সৈন্যসংখ্যা তখন তিন লক্ষেরও কম। বিশৃঙ্খল অবস্থা। অস্ত্র-শস্ত্র ও যানবাহন অসম্ভব। পথ-ঘাট অপর্যাপ্ত। জনসাধারণের মধ্যে অন্তর্দাহ। এরূপ পরিস্থিতির মধ্যে রাজনৈতিক নেতারা সরকারী শাসনযন্ত্রের উর্দ্ধে থাকলেও, প্রশাসনিক কঠোর দায়িত্ব সিভিলিয়ানদের হাতেই বর্তিল। তাদের বিশ্বস্ততা যাই থাকুকনা কেন, কার্যক্ষেত্রে তারা অভিমাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। হঠাৎ পরাধীনতার মনোভাব কাটিয়ে উঠা, তক্ষুনি সম্ভব ছিলনা। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও প্রজাতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থা বিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হলেও, আভ্যন্তরিন প্রতিক্রীয়াশীল শক্তিগুলির প্রতি নমনীয় ভাব প্রদর্শন করায়, তাদের মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে বেশী সময় লাগেনি। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির প্রতি নির্বিকার থাকার ফলে, তারা নির্যাতিশয় হয়ে উঠতে দেখা যায়। কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে অত্যধিক মনোযোগ দেওয়ার ফলে, এত বড় দেশের প্রতিরক্ষা বিষয় অবহেলিত হয়ে থাকে।

১৯৪৯ সালে অপরদিকে চীন ভাবছে কার্লমার্কসের কথা :

"Anything that helped a revolution was moral." ভাবছে লেনীনের কথা : "The more powerful enemy can be conquered only by exerting the utmost effort and by necessarily, thoroughly, carefully, attentively and skillfully taking advantage of every, even the smallest rift amongst the bourgeosie, of every antagonism of interest amongst the bourgeosiec of various groups or types of bourgeosie within the various countries by taking advantage of every, even the smallest opportunity of gaining a mass ally,

even though this ally be only temporary, vacillating unstable, unreasonable and conditional. Those who do not understand this do not understand a particle of Marxism or scientific modern socialism in general."

চীনের সৈন্যসংখ্যা তখন বিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার। তারা নিয়মানুগ ও সুশিক্ষিত। চিয়াং-কাই-শেক কর্ণধার থাকা কালে আমেরিকার বহু অস্ত্র-শস্ত্র সংগৃহিত হয়েছিল। জাপানীদের কাছ থেকেও বহু সমর-সামগ্রী পেয়ে যায়। পরন্তু লাল আমানার যেহেতু রুশিয়া চীনের মিত্ররাষ্ট্র, সেইহেতু, সেদেশ থেকে বিস্তর যানবাহন, সমর-সম্ভার, বিমান, গ্যাসদ্রব্য ও নুক্লিক্যাণ্ট পদার্থ পর্যাপ্ত পরিমানে আমদানী হচ্ছিল। ইহা ভিন্ন নিউক্লিয়ার শক্তির প্রসারণেও যথেষ্ট সহায়তা লাভ করেছিল। এই আবহে তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল তিব্বতের দিকে। সে সময়ের মধ্যে তাদের আগ্রাসী কার্য সম্পন্ন হলে, তারা তিব্বতীদের প্রমদাস পরিণত করে সেখানকার সম্পদকে সমর-সম্ভার সংগ্রহে ও দক্ষিণী ঘাঁটি নির্মাণে ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, Ethnologist বা মানব-জাতি তত্ত্বজ্ঞরা বলেছেন যে বিশ্বের আদিম জাতিগুলির মধ্যে তিব্বত অন্যতম। তারা "yellow Man" চীনাদের থেকে স্বতন্ত্র এবং প্রাচীন তুর্ক ও মঙ্গলদের সমগোষ্ঠি। পীত-চীন লাল-চীনে পরিণত হওয়ার পর হাস্যাস্পদভাবে ঘোষণা করতে লাগল যে, তিব্বতীরা তাদের 'হান' জাতীয় গোষ্ঠি। মিঃ রিচার্ডসন তাঁর 'A short history of Tibet' গ্রন্থে দুঃখ করে লিখেছেন—

Tibet with a tiny peaceful population could so easily have been allowed to live on under remote Chinese control, and develop on its own lines, preserving those qualities and difference which made its civilisation valuable to the rest of the world without constituting the faintest threat to China.

ইতিমধ্যে ভারতের উত্তর-পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চল সমূহের প্রতিরক্ষা বিষয়ে বিবরণের জন্য ১৯৫১ সালের প্রথমভাগে হিম্মৎসিং কমিটি নিয়োগ করা হয়। এই কমিটি দুই প্রান্তের দুইটি পৃথক রিপোর্ট দেন। প্রথম ভাগ সিকিম, ভুটান, নেফা ও ভারত-ব্রহ্ম সীমান্ত বিষয়ে। দ্বিতীয়টি লাডাক, হিমাচলপ্রদেশ, পঞ্জাব, উঃ প্রদেশ ও নেপাল সংক্রান্ত। এই রিপোর্টেই কেন্দ্রীয় এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যসরকারগুলির কান খাড়া হয়ে যায়। অঞ্চলগুলির প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও নিরাপত্তা বিষয়ে গভীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। অতি বৃহৎ ও অত্যুচ্চ পার্বত্য অঞ্চলের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্বিসহ অবস্থান বিষয়ে সরকার সচেতন হয়ে ওঠেন। কেন না তা চীনের সঙ্গে সমস্ত জাতীয় সম্পদ সংকেটাপন্ন। জাতীয় স্বার্থে অন্ততঃ পঁচিশ বৎসর প্রতিবেশীর সহিৎ শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের সুযোগ থাকা একান্ত আবশ্যক। তার পরিপন্থী কিছু ঘটলে সমূহ বিপদ। সে জন্যই ১৯৫৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর চীনপরিদর্শন কালে পঁচিশ বৎসরের চুক্তির প্রস্তাব স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু ১৯৫৬ সালে চৌ-এন-লাই যখন ভারতে আসেন তখন দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে সীমান্ত বিষয় নিয়ে বিশেষ ভাবে আলোচনা হয়। যদিও 'ম্যাকমোহন লাইন' সম্বন্ধে চীন প্রধানমন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন, তাহলেও তথ্য ও যুক্তির দিক থেকে ভারতীয় দাবীকে তিনি অস্বীকার করেন নি। অন্যান্য ছোটখাটো অঞ্চল সম্বন্ধে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা দ্বারা মিমাংশা করা হবে বলে স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু তাঁর প্রত্যাবর্তনের পর চৈনিক কম্যুনিষ্ট পার্টির নবম কংগ্রেসে প্রতিরক্ষামন্ত্রী লীন পিয়াও যে ভাষণ দেন তা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন—The chinese Govt., held repeated negotiations with the India Govt. on the Sino-Indian Boundary question. As the re-actionary India Govt. had taken over the Briti sh Imperialist policy of aggression, it insisted that we

recognise the illegal Momohan line which even the reactionary Govt. of different periods in old China had not recognised, and moreover, it valliantly attempted to further occupy the Aksai Chin which is always been under Chinese jurisdiction, thereby disrupting Sino Indian boundary negociation এর অর্থ অতীব পরিষ্কার। চীন বলছে আকসাই চীন তাদের সম্পত্তি। অপরদিকে তারা লাডাক ইতিমধ্যেই দখল করে বসে আছে। সে সম্বন্ধে আলোচনারই কোন অবকাশ নেই। পরন্তু চীন 'ম্যাক্‌মোহন লাইন' পুরোপুরিই অস্বীকার করছে। এমন কি '৫৪ সালের চুক্তির সময়সীমা আট বৎসরের অধিক অনাদৃত। যেন অনেকটা 'heads I win tails you lose' ধরনের ভেল্কি। যার পরিকল্পনা আট্‌বৎসরের ব্যবধানকে অবলম্বন করেই ওইর কার্যক্রম স্থিরীকৃত হয়েছিল। এই উপলক্ষে জিন্‌স্‌বার্গের "Communist china and Tibet" নামক গ্রন্থের কথা মনে পড়ছে। যা থেকে এ ভেল্কির উদ্দেশ্য পরিষ্কার ভাবে অনুধাবন করা যায়। তিনি লিখেছেন :

"—he who holds Tibet dominates the Himalayan piedmont ; he who dominates the Himalayan piedmont threatens the Indian sub-continent : and he who threatens the Indian sub-continent may well have all of South-East-Asia within his reach, and with it all of Asia. China had always claimed rights in Nepal, Bhutan and Sikkim on grounds of traditionals. ethnic, cultural and religious affinity between the populations of these lands aud Chinas Tibetans regions and the chief aim of Pekings current manipulations in this region seemed to be to detach these territories from India and integrate them into the Chinese or bit by any means short of war, if possible."

এইরূপ পরিস্থিতিতে খানিকটা আত্মসম্বিৎ ফিরে আসাতে লি'তে পূর্বস্থিত ঘাঁটি থেকে মুদ্‌রাং এর এলাকায় নূতন ঘাঁটি স্থাপনের উদ্দেশ্যে করমসিংকে প্রেরণ করা হয়। ২০শে অক্টোবর ১৯৬২ তারিখে অনেক স্থানীয় ব্যক্তি সমভিব্যাহারে একজন কনেষ্টবল কজালা'র দিকে অগ্রসর হয়, পরবর্তী ঘাঁটির স্থান নির্বাচনের জন্য। তারা ফিরে এলোনা। সুতরাং পরদিন ঐতিহাসিক ২১শে অক্টোবর তারিখে বিশ জন লোক ও একটি ছোট পন্টাদ প্রহরী দল সহ করমসিং তাদের অনুসন্ধানে বের হয়। আচম্বিতে তাদের উপর চৈনীক প্রহরী দল কর্তৃক আক্রান্ত হয়। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আট ব্যক্তি প্রাণ হারায়। অপর ব্যক্তিগন বন্দী হয়। এই ঘটনায় সারা ভারত স্তম্ভিত ও মূক হয়ে ওঠে। তুমুল প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। এই ঘটনা ভবিষ্যৎ ভারতের দিশারীরূপে পরিগণিত হয়ে আছে। পণ্ডিত নেহরুকে ২১শে নভেম্বর লোকসভায় বলতে শুনা যায় :

"I am proud of that reaction."

তার পরের ঘটনা অতিশয় স্পষ্ট। কিন্তু প্রায় ১২,০০০ মাইল দুর্ভেদ্য পার্বত্য অঞ্চল অধিগ্রহণের পর অকস্মাৎ মাও-সি-তুংএর অস্ত্র সম্বরণের অভিপ্রায় ঘোষণা করার তাৎপর্য কি। চীনাদের মনোবৃত্তি চিরকাল হেঁয়ালীভাঙা এবং গোলমেলে। মাও-সি যখন যা করেন তা গভীর উদ্দেশ্যপ্রণোদিতও বটে। হয়ত বা আলোচনার সূত্রপাত করে পরবর্তী উদ্দেশ্য সাধনের প্রস্তুতি। এটাই তাদের জাতীয় চরিত্র। এই উপলক্ষে পণ্ডিত নেহরুর ঐতিহাসীক বিশ্লেষণ একান্ত প্রণিধান যোগ্য।

"—The real cause was nothing else. That something was the basic eternal conflict

between China and India. The two Civilisations had fought each other over centuries and none had so far been able to overcome the other. China did not want any country near her which was not prepared to accept her leadership or direction ; but because India would not accept that leadership, so India had to be humiliated. Though India would not interfere with what was happening within China, yet she came in India's way by the mere fact of her separate political structure and pursuing separate policy which was succeeding. It was a challenge to China and it created an impression in the countries round about, which was adverse to China. This was the basic cause of the conflict. So it became necessary for China to remove this obstruction —remove in the psychological cause—to show to other countries that though India might be very big on the map, yet India was no match against China. But neither China could carry through the war into the plains of India, nor could India carry the war through Tilect into China." স্বর্গত কিন্তু মার্কাস আয়ুথ খানও অনুরূপ ধারণার কথাই বলেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের একটী উক্তি Marie Lousie Burke-এর "New Discoveries" নামক পুস্তক থেকে উদ্ধৃত করছি। তিনি লিখেছেন :

"At a time when William Plkehanov could not even imagine, Lanin did not even dream, Mas-Tse-Tung was yet to be born, the future picture of Russia and China was fore seen by Swami Vivekananda's supernatural eyes. About Maoist China he also said that when British should leave India, there is a great danger of India being conquered by the Chinese." প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে স্বামীজীর অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন এই ভবিষ্যদ্বানীর কথা যদি আমরা বিস্মৃত না হতাম, তবে হয়ত সেদিন চৈনীক ঔদ্ধত্যের একটি ন্যূনতম জবাবও আমরা দিতে পারতাম। তবে প্রতিরক্ষা দপ্তরের দায়িত্ব এড়াবার জন্য যেভাবে Mankekar তাঁর Guilty Men of 1962 এবং Khera-র India's Defence Problem' পুস্তকে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে তুলে ধরা হয়েছে তা সমর্থনযোগ্য নহে। অবশ্য ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের শ্রীবি. এন. মল্লিক তাঁর প্রখ্যাত 'The Chinese betrayal নামক গ্রন্থে একান্ত যুক্তিসঙ্গতভাবে তাদের সমালোচনা করেছেন।

পরিশেষে বিশিষ্ট সাহিত্যিক নেভিলী ম্যাক্সওয়েলের প্রশস্তি গ্রন্থ 'India's China war' এ চীনের যে মনোজ্ঞ চিত্র তিনি এঁকেছেন তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে গিয়ে বিশিষ্ট প্রবন্ধকার এ. জে. পি টেলর বার্ণার্ডশকে সম্মুখে রেখে যা বলেছেন তাতে আমাদের দৃষ্টি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছে। তাঁর কথা :

"IN BACK TO MATHUSALAH, Bernard Shaw foretold that the Chinese would one day run the world. If their behaviour as recounted in this book is any guide, there could be no better outcome for mankind." তার উত্তরে আমরা মিঃ টেলর ও ম্যাক্সোয়েল সাহেবকে এ কথাই বলবো যে, তাঁরা যেন তাঁদের মনোরম দেশের ভবিষ্যৎ ভাগ্য নির্দ্ধারণের জন্য চীনাদের আমন্ত্রণের পূর্বে বর্ত্তমান ক্রিশ্চিয়ানদের সঙ্গে একবার কথা বলে নেন এবং বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় সাংবাদিক পরলোকগত ক্রাঙ্ক মোরেসের চীন বিষয়ক সংবাদ ও বিবৃতির সঙ্গে একবার পরিচিত হবার সুযোগ গ্রহণ করেন।

কি পেয়েছি আর কি পাইনি

—শান্তিশরণ রায়চৌধুরী

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সাতাশ বছর পূর্ণ হতে চলেছে। কি পেয়েছি আর কি পাই নি,-তার একটা হিসাব মেলাতে চাওয়া প্রত্যেক ভারতবাসীর পক্ষে স্বাভাবিক। বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে গেলে, একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে স্বাধীনতা উত্তর কালে আমাদের অনেক দিকে যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে। শিল্পক্ষেত্রে, কৃষিক্ষেত্রে এবং দেশরক্ষা বিভাগে আমাদের প্রযুক্তিবিদ্যা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে অগ্রগতির মনে বেশ আশাব্যঞ্জক। জগৎসভায়, ভারত একটি সম্মানের আসন প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে, এ সত্যও অনস্বীকার্য। নীতি হিসাবে প্রধান শিল্প, বিদ্যুৎ, কয়লাখনি, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি জনসাধারণের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত, অনেকক্ষেত্রে জাতীয় করণের নীতি অনুসরণ করে, রাষ্ট্রকে একটা সমাজ তান্ত্রিক রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা হয়েছে এবং এই সম্বন্ধে পরিকল্পনা গ্রহণ করে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যেকার বৈষম্য দূর করার সপথও আমরা গ্রহণ করেছি। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিতে দৃঢ়তাপূর্ণ নিষ্ঠার স্বাক্ষরও আমরা রেখেছি। সারা বিশ্বে উত্তেজনাপূর্ণ ও সংঘর্ষের আবহাওয়াকে দূর করার সঙ্কল্প নিয়ে, যুদ্ধমান মনোভাবকে সংযত করে, আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সকল বিবাদ বিসংবাদ মিটিয়ে ফেলবার নীতির আমরাই প্রধান প্রবর্ত্তক, এ সত্যকেও কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু এগুলি হল খতিয়ান পত্র বা ব্যালান্স শীটের জমার দিক। কিন্তু এর খরচের দিকও একটা আছে। এই দুই দিকের সমীক্ষার পর, পাল্লাটা কোন দিকে ভারী হয়, তার ফলশ্রুতি হিসাবে সাধারণ মানুষের দুঃখদুর্দ্দশা কতটা লাঘব হয়েছে, তার হিসাবও দেশের মানুষ করবেই। তারা পরিকল্পনার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে বিদগ্ধজনের পণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা, বা দুরভিসন্ধিপূর্ণ মতলববাজ রাজনৈতিকদলের গগনভেদী চীৎকার বা শাসকদলের অবদানের স্ফীত পরিসংখ্যান কোনটাতেই বিশেষ আগ্রহী নয়। সবকর্ম্মের বিচার তারা করবে, নিজেদের কল্যাণ কতটা সাধিত হয়েছে, খাওয়া পরা, বিদ্যাশিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান প্রভৃতির মত দৈনন্দিন সমস্যার কতটা সমাধান হয়েছে, সেই মানদণ্ডে। সেদিক দিয়ে জনতার রায় শাসকদলের পক্ষে যাবে কতটা, তা বুঝতে অসাধারণ ধী-শক্তির প্রয়োজন হয়না। পুডিং-এর গুণাগুণ যেমন পুডিং খেলেই বোঝা যায়, তেমনি মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা কতটা সহজ ও আনন্দদায়ক হয়েছে, সেই মানদণ্ডেই শাসকদলের যোগ্যতা অযোগ্যতা নির্ণয় করবে। বর্ত্তমানে অতি সাধারণ ভাবেই জীবন যাপন করা মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে এবং ক্রমবর্দ্ধমান ভাবে এই দুর্বিসহ যন্ত্রণা মানুষকে প্রায় পঙ্গু করে ফেলছে। সরকারী পরিসংখ্যানই বলছে যে দারিদ্র সীমারেখার নীচে বাসকরতে বাধ্য হচ্ছে আমাদের দেশের অন্ততঃ শতকরা চল্লিশ ভাগ মানুষ। এই সর্বনাশা অবক্ষয়কারী বিরোধী স্রোতের গতিরোধ কি হবে না? কে করবে সেই মহৎ কাজ? কে দেবে মানুষকে মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি? কোথায় মুক্তি-গঙ্গার নব-ভগীরথ? এই সব প্রশ্নগুলিই জনমানসে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। যন্ত্রণার ব্যাপকতা ও তীব্রতা দেশব্যাপী একটি স্ফুটোন্মুখ আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি করে চলেছে এবং আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ঘটে, অসন্তোষের গলিত লাভা যেদিন ভয়ঙ্কর রূপে আত্মপ্রকাশ করবে, দুর্দ্দিনের সেই দারুণ দিনের কথা ভেবে প্রত্যেক চিন্তাশীল মানুষ আজই উদ্বেগে, উৎকণ্ঠায়, দুশ্চিন্তায় কাতর হয়ে উঠেছেন। কিন্তু যাদের অন্নাধর্ম্মের জন্য এই পরিস্থিতির উদ্ভব হতে চলেছে। তাদের কি কোন দুশ্চিন্তাই নেই। এই অঘটনকে প্রতিরোধ করতে তাদের কি কোনও

পরিকল্পনাই নেই ? 'যথাসঙ্কোচ মুক্ত, আধা-আধি কোন ব্যবস্থায় এ সর্বনাশ রোধ করা যাবে না। সমাজে এবং রাষ্ট্রে যে ব্যাধি শিকড় গেড়েছে, তাকে নির্মূল করতে হলে ওষুধটাও তেমনি শক্তি সম্পন্ন হতে হবে। এছাড়া কোন পথ নেই।

অল্পপরিসরে কয়েকটি উদাহরণ দিলেই বক্তব্যটা আরো পরিষ্কার হবে। বিস্তৃত আলোচনা করা এই স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়।

আজকের দিনে মুদ্রাস্ফীতি যে মানুষের দুঃখ কষ্টের একটি প্রধান উৎস একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। মুদ্রাস্ফীতিকে সফল ভাবে রোধ করতে হলে চাই অধিক পরিমাণে উৎপাদন। অন্যত্র কা কথা। জাতীয় করণের পর সরকারই ত বহু অত্যাবশ্যক সংস্থার মালিক হয়েছেন। রাজনীতির রূপে পড়ে, প্রতিপক্ষী দলে নিজেদের ভাবমূর্তি গড়ে তোলার আকাঙ্খায়, উৎপাদনের পরিমাণের দিকে নজর না দিয়ে কেবল কর্মীদের মাহিয়ানা, বোনাস্ প্রভৃতি সুযোগ সুবিধা বহুল করে উৎপাদন ব্যয় অসম্ভবরকমে বাড়িয়ে তুলেছেন নির্বোধের মত। শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের বিরুদ্ধে আমরা কখনই নই। তারাও আমাদের দেশের মানুষ, খেয়ে পরে সুখে স্বাচ্ছন্দে থাকুক, এটাই আমরা চাই। কিন্তু কাজ না করে, উৎপাদন না বাড়িয়ে, ঋতুপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের দাবী দাওয়া পূরণ করা হবে কেন ? তারা সমগ্র দেশের জন সংখ্যার কত শতাংশ ? শতকরা পাঁচ দশ জনের স্বার্থরক্ষার জন্য, শতকরা ৯০ ৯৫ ভাগের স্বার্থবলি দেওয়া হয়েছে কোন্ যুক্তিতে ? কেন তাদের বেতন, বোনাস্ ইত্যাদি উৎপাদন ভিত্তিক করা হয়নি ? এত করেও তাদের সন্তুষ্ট করা এবং উৎপাদন বৃদ্ধির অবশ্য কর্তব্য পালন করতে পারা গিয়েছে কি ? গিয়ে গণ্ডগোল হলেই, সরকার জাতীয় করণের মাথায়ে তার মীমাংসা করতে চেয়েছেন। পেরেছেন কি ? মোটেই নয়। আর একটি মারাত্মক বৈশিষ্ট লক্ষ্য করা যাচ্ছে সরকারী পরিচালনাধীন সংস্থাগুলিতে প্রশাসনিক চরম ব্যর্থতার জন্য তারা মূল্যমান কমাতে ত পারছেনই না, বরং সরকারের অন্যায় হস্তক্ষেপ ঘটলেই দাম হু হু করে বেড়ে চলেছে। চোরাকারবারী, মুনাফাশিকারীরা কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে যখনই জিনিষপত্রের দাম আকাশচুম্বী করে তোলে, সরকার তখন সেই দামকেই সেই স্তরে বেঁধে দিয়ে, বেআইনী কাজকে আইন সঙ্গত করে তুলছেন। এমন অদ্ভুত ব্যবস্থার কথা কি কেউ কখনও শুনেছেন ? কয়লার দাম বাড়িয়ে বেসরকারী মালিকরা যায় বাড়াচ্ছিলেন এই অজুহাতে কয়লাখনি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হল। ফল কি হয়েছে ? শুধু দামই ক্রমাগত বেড়ে চলছেনা, উৎপাদনও হ্রাস পেয়েছে আশঙ্কাজনক ভাবে। চাকুরীর স্থায়িত্ব হয়েছে, প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সুযোগ এবং আরো সুযোগ তাদের মিলেছে কিন্তু কাজ তারা করছে না। ব্যক্তিগত মালিকানা থাকলে, কাজ না করলে, ঘাড়টি ধরে বের করে দিয়ে চাকুরী খতম করে দিত। কিন্তু সরকার কি এতই শক্তিহীন, তাদের আইনের তূনীরে কি এমন একটি শরও নেই যার দ্বারা এর মোকাবিলা করা যায় ? তা না থাকলে সরকারের অস্তিত্বের সার্থকতা কোথায় ? সরকার বলছেন, হতাশ ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের উস্কানীতে কর্মীরা কর্মবিমুখ। সরকার কেন নামের তালিকা প্রকাশ করে দিয়ে এদের স্বরূপ প্রকাশ করে দিচ্ছেন না জনসমক্ষে ? তাদের প্রশাসকদলের মধ্যেও কি দেশের স্বার্থ বিনষ্টকারী লোক নেই ? এই উভয় প্রকারের লোকদের কেন দেশ-দ্রোহীতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় না ? শুধু সাধু সঙ্কল্প খবরের কাগজের মাধ্যমে প্রকাশ করেই সব সমস্যার সমাধান করা যাবে বলে যদি রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা ভেবে থাকেন, তবে তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন বলতে বাধ্য হব।

ধরুণ, রেলের ব্যাপার। রেল বিভাগে চুরি, অপচয় যদি বন্ধ করা যায়, সৎ ও দক্ষ প্রশাসন যদি প্রবর্তন করা যায়, তবে অনেকে মনে করেন, রেল বিভাগে ঘাটতি দূরের কথা, রেলের লাইনকে সোনা দিয়ে মুড়ে দেওয়া যায়। মাল পাঠাতে যান, পয়সা দিতে হবে, রিজারভেশন করতে যান পয়সা দিতে হবে। বিনাটিকিটে ভ্রমণ করতে উৎসাহ ও প্রশ্রয় দেয় রেলের একদল কর্মীরা। কম ওজনের মাল বুক করে, রেল কর্মীরাই ব্যবসায়ীর

সঙ্গে যোগসাজসে রসিদে বেশী ওজন লিখে দিয়ে, প্রেরকদের কোটী কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে রেলবিভাগকে বাধ্য করছে। মহাভারতের সমান নজীর উদ্ধৃত করা যায়। সরকার এদিকে দৃষ্টি না দিয়ে ক্রমাগত ভাড়া, মাশুল বাড়িয়ে চলেছেন। এ ত জল ঢেলে ফুটো পাত্রে বুথা চেষ্টা তৃষ্ণা মেটাবার। অঙ্কের অপকীর্তির মাশুল বর্দ্ধিত ভাড়ার মারফৎ নিরীহ, সৎ জনসাধারণকে দিতে বাধ্য করা হবে কেন? ওদের সংগঠন আছে বলেই কি সংগঠনহীন সাধারণ মানুষকে জরিমানা দিয়ে যেতে হবে নির্বিবাদে এবং চিরদিন? এটা কোন সভ্য সরকারের পক্ষে প্রশংসা জনক?

আরো একটী সমস্যার কথা ধরুন। তারস্বরে বলা হয়, কালোটাকার রাজত্ব সমান্তরালে চলছে, সরকারী টাকার রাজত্বের সঙ্গে। এমন কি কোন উপায় নেই যে এই নরহত্যাকারী দস্যুদের সঙ্গে মোকাবিলা করা যায়? তবে কিসের জন্য হাজার হাজার কোটী টাকা ব্যয় করে পাত্র, মিত্র, কোটাল মন্ত্রীদের তখ্‌তে বসিয়ে রাখা হবে? এই দুষ্ট পদ্ধতির সৃষ্টির জন্য বর্ত্তমান নির্বাচন পদ্ধতি বিশেষভাবে দায়ী বলে অনেকে মনে করেন। নির্বাচন ভাণ্ডারে যে টাকা চাঁদা ব্যবসায়ীরা দিতে বাধ্য হন তার দশগুণ টাকা তারা তুলে নেন জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে। এই ধারণা ভিত্তিহীন নয়। তবে দেশের স্বার্থে প্রয়োজন হলে নির্বাচন পদ্ধতি কাঠামো প্রভৃতি কেন বদল করা হবে না? আসল কথা হচ্ছে, রাষ্ট্রনায়কদের সদিচ্ছা ও শুভপ্রচেষ্টা থাকতে হবে। তার মধ্যে কোন ভেজাল থাকবে না। নিজেরা দুর্নীতির উর্দ্ধে থাকবেন টাকা পয়সার আয়ব্যয় সম্বন্ধে কঠোর ও সত্যাশ্রয়ী হবেন, মানুষের দুঃখদুর্দ্দশা সম্বন্ধে অবহিত এবং আন্তরিকভাবে সহানুভূতিশীল থাকবেন এবং সেগুলি দূর করতে নিবেদিত প্রাণ হবেন তবে হয়ত কাজ কিছু হবে। নতুবা সব তর্জ্জন গর্জ্জন শরৎকালের প্রভাতে মেঘাড়ম্বরের মত "বৃথারম্ভে লঘুক্রিয়া" র পরিণত হতে বাধ্য।

আরো একটী কথা বলে শেষ করি। মুদ্রাস্ফীতি রোধের জন্য, কর্মীদের আয়ের কিছুটা অংশ সাময়িক ভাবে জমাট করে দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী, এম, পি, এম, এল, এ দের সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি? একযাত্রায় পৃথক ফল কেন? 'আপনি আচরি ধর্ম্ম, জীবেরে শিখায়' এই নীতি এদের বেলায় অপ্রযোজ্য? জিনিসপত্রের মূল্যমান নিম্নমুখী (অন্ততঃ স্থিতিশীল) না করতে পারলে এই ক্ষীণ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। টাকার প্রচলন কমাতে পারলে মুদ্রাস্ফীতি রোধের সহায়ক হবে বলে বলেন অর্থনীতিবিদ্‌রা। আমাদের বাস্তব একটী প্রস্তাব আছে। সরকারী পর্য্যায়ে অপব্যয় বন্ধ করে, ব্যয় সঙ্কোচ করুন সরকার। প্রথম দফাতেই সরকারী খরচায় যানবাহনগুলির ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে। এই গাড়ীগুলি এত ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহৃত হয়, তা বলার নয়। এতে পেট্রোলের সীমাহীন ব্যয় হয় এবং নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যবহারের খবর গোপন রাখতে ড্রাইভার-দের "ওভারটাইম" এর জন্য বাড়তি টাকা দেওয়া হয়। মন্ত্রীদের পরিবহন খরচাও নির্দ্দয়ভাবে সঙ্কুচিত করতে হবে। মন্ত্রী বা এম, পি, এম, এল, এ হওয়ার আগে যারা সাধারণ খরচায় যাতায়াত করত, তাদের এই নবাবী করতে দেওয়া হবে কেন? অবশ্য অত্যন্ত জরুরী কাজের জন্য সীমিতভাবে পরিবহন ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে। আর দলীয় কর্ত্তাদের অনুগ্রহ-ভাজন হওয়ার জন্য, বা দল রাখার জন্য যারা হামেসা বিদেশ ভ্রমণ করে বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় করছে, পাঁচ বছরের জন্য এই সব খরচা নিষিদ্ধ করে দিতে হবে। উদাহরণের মাধ্যমেই লোকশিক্ষা দিতে হবে। এই আদর্শের অনুসরণ উপরের তলায় দেখলে, সাধারণ মানুষও সদিচ্ছা প্রণোদিত হবে। অবশ্য তাদের যা অবস্থা, তাদের পক্ষে জীবনত্যাগ করা ভিন্ন আর কিছু ত্যাগ করার মত কিছু নেই। এই ভাবে কাজ করলে টাকার প্রচলন কমবে বহু পরিমাণে এবং মুদ্রাস্ফীতি রোধ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার পক্ষে সহায়ক হবে বহুল পরিমাণে (এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার ক্ষেত্র নয়)।

জাতির নৈতিক মেরুদণ্ডকে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে দিনে দিনে। অর্থনীতিতে একটা মতবাদ আছে—"Bad money drives out good money out of Circulation. রাজনীতি ক্ষেত্রের দিকে তাকালে এই সিদ্ধান্ত করা যায় "Bad men are driving out good men out of Circulation". ফলে প্রশাসনে, নির্বাচন তালিকায় সৎ, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক মানুষদের ক্রমে ক্রমে কোণঠাসা করে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হচ্ছে। তাই প্রয়োজন মানবতাবাদী, স্বদেশহিতৈষী শ্রেয়োনৈতিক আদর্শের পুনর্বাসন। আদর্শহীনতাই শুধু নয়, আদর্শভ্রষ্টতাও জাতীয় চরিত্রের অবক্ষয় ঘটিয়েছে প্রচুর পরিমাণে। দেশের ঐতিহ্য, দেশের ভবিষ্যৎ আজ বিপন্ন। এর বিধ্বংসী অধোগতির অবরোধ করতে না পারলে, সমূহ সর্বনাশ অনিবার্য। জাতীয় নেতৃবৃন্দ এবং দেশের মানুষের—উভয়েরই কর্তব্য বিরাট। দেশের মানুষের নিকট অনুরোধ তারা যেন স্বাধীন নাগরিক হিসাবে, জোটী কণ্ঠে আওয়াজ তোলেন অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ নেই, অবিচার তারা সহ্য করবেন না, অযোগ্যতা, অপদার্থতা ক্ষমতালিপ্সা, অর্থগৃধ্নুতা তারা সমূলে বিনাশ করবেনই। এবারকার স্বাধীনতা দিবসে এই সঙ্কল্প তাদের গ্রহণ করতেই হবে এবং সুখী সমৃদ্ধ ভারতবর্ষ গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করবেন।

এই বৎসরের স্বাধীনতা দিবসে এই শপথ নেবেন কি নেতৃবৃন্দ যে অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ নেই, জনসেবার সর্বোচ্চ আদর্শকেই তারা গ্রহণ অনুসরণ করবেন জীবনের ব্রত হিসেবে? অতীত দিনের মহানায়কবৃন্দ, শহীদ ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ধ্যানের ও আদর্শ ভারত গড়ে তুলবেন? তাঁদের স্মরণে রাখতে অনুরোধ করি বিদ্রোহী কবি নজরুলের সাবধান বাণী। "কাল কারার ভগ্নহস্তা জন্মিছে প্রতিনিয়ত"।

পরবর্তী স্বাধীনতা দিবসে আমরা শুনতে চাই না "নেই, নেই। দেখতে চাই, "আছে, বাড়ছে এবং আরো

জয়হিন্দ।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও প্রযুক্তিক্ষেত্রের অগ্রগতির থেকে ভারত সমৃদ্ধ হতে চায়। কিন্তু একটি সীমা পর্যন্ত। সেটা পাশ্চাত্য সমাজকে অনুকরণ করতে নয়, নিজের উন্নতি করতে। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক সমাজে আমরা পরিষ্কার ভারতীয় ব্যক্তিত্ব রক্ষা করতে চাই। —শ্রীমতী ইন্দিরাগান্ধী।

● ●

নিজের শক্তিকে আপনারা অবিশ্বাস করিবেন না—
নিশ্চয় জানিবেন, ভারতবর্ষের মধ্যে একটি বাঁধিয়া
তুলিবার ধর্ম্ম, চিরদিন বিরাজ করিতেছে।
—রবীন্দ্রনাথ।

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী

বড়লাটের উপর আক্রমণ [তিন]

—সুবোধ মজুমদার

১৯০৫ সনের শেষে স্কুল ছেড়ে রাসবিহারী চলে যান অমৃতসহরে পিতার কাছে। সেখানে তিনি চাকরি করতে লাগলেন সরকারী প্রেসে। মনে মনে তাঁর অহর্নিশ জ্বলছিল একটি মাত্র কামনা—ভারত থেকে বিতাড়িত করবেন ইংরেজ রাজশক্তিকে, আর তার জন্য একই সময়ে বিদ্রোহ ঘটাবেন ব্রিটিশ ভারতের সমগ্র সেনা-শিবিরে।

মহারাষ্ট্র প্রদেশের ঠাকুর সাহেব সেনাবাহিনীর মধ্যে বিপ্লবের মন্ত্র ছড়াচ্ছিলেন আগে থেকেই। বাংলা থেকে নিরালম্ব স্বামী গিয়ে যোগ দিলেন সেকাজে। তাঁর কর্মস্থল হলো উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, মধ্যভারত ও উত্তর প্রদেশ। রাসবিহারী ভর্তি হয়ে গেলেন সেই বিরাট বিপ্লবী দলে, এবং স্বীয় কর্ম-প্রতিভায় অল্পবয়সেই হয়ে উঠলেন অন্যতম নেতা: সংগঠনের প্রয়োজনে ১৯০৬ সন থেকে তিনি থাকতেন দেরাদুনে। তাঁর মাইরের পরিচয় ছিল ফরেষ্ট আপিসের বড়বাবু আর সাহেবদের ভারতীয় ভাষা শিক্ষক। অল্পকাল পরে লালা হরদয়াল ও জিতেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদেশে চলে গেলে তিনিই হলেন বিপ্লবী সংগঠনের শীর্ষ নেতা।

ইতিমধ্যে অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে গিয়েছিল বাংলা দেশের ওপর দিয়ে। ১৯০৫ সনে ব্রিটিশ সরকার বাংলার শক্তিকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে দুভাগে ভাগ করে তাকে। সে কার্যের প্রতিবাদে সারা বাংলা জুড়ে দেখা দেয় প্রবল আন্দোলন। সে আন্দোলন দমন করার জন্য ব্রিটিশ সেনা ও পুলিশ অকথ্য অত্যাচার করে বংগবাসী নরনারীর ওপর। অমনি বাঙালী বিপ্লবীরা গর্জে উঠল বোমা আর পিস্তল নিয়ে। শহিদ হলেন ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, কানাই লাল, সত্যেন বোস প্রভৃতি। অবশেষ ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হলো বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করতে।

ব্রিটিশ সরকার পরাজিত হলো বাংলার বিপ্লবী তরুণদের কাছে। সমগ্র ভারতবাসী গৌরবান্বিত বোধ করল বাঙালীর গৌরবে। সমগ্র ব্রিটিশবাসী লজ্জিত ব্যথিত বোধ করল তাদের সেনাবাহিনীর ও পুলিশ বাহিনীর অক্ষমতায়। ফলে ব্রিটিশ শাসকদের নৈতিক বল ভেঙ্গে গেল অনেক খানি। তারই পুনরুদ্ধার করে আর নিজেদের নতুন করে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতের রাজধানী স্থানান্তর করলেন কলকাতা থেকে দিল্লীতে। ১৯১১ সনে শুরু হলো এ কাজ। ১৯১২ সনের ২৩শে ডিসেম্বর নতুন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জকে মহাসমারোহে অধিষ্ঠিত করা হবে দিল্লীর সিংহাসনে।

ভারতের বিপ্লবীরা স্থির করলেন বড়লাটের গায়ে বোমা নিক্ষেপ করে আবার ভেঙ্গে ফেলা হবে ব্রিটিশের নৈতিক বল। বৃটিশরা বিশ্বের কাছে প্রচার করে ভারতবাসী অন্তর থেকে কামনা করে তাদের শাসন—এ কাজের ফলে তাও হয়ে যাবে মিথ্যা প্রমাণিত। কিন্তু কি করে করা যাবে এ অসাধ্য সাধন? সহস্র সহস্র গুপ্তচর, কন্‌ষ্টেবল্ আর সৈনিকে যে ঘিরে থাকবে বড়লাটের শোভাযাত্রা সমগ্র দিল্লী যে সেদিন কম্পিত হতে থাকবে পুলিশ কর্মচারী আর সেনাবাহিনীর সতর্ক প্রহরার দাপটে।

অতএব এই অসাধ্য সাধনের গুরু দায়ীত্ব ভার ন্যস্ত হলো স্বয়ং নায়ক রাসবিহারীর ওপর। তিনি কলকাতা এসে নদীয়ার বিপ্লবী যতীন বিশ্বাসকে নিয়ে গেলেন দেরাদুনে। তারপর শুরু হলো বোমা নিক্ষেপের ট্রেইনিং বেশ কয়েক মাস আগে থেকেই। কলকাতা থেকে জেনে নেওয়া হলো:—বোমার আকার কি হবে, ওজন কি হবে, শক্তি কি হবে। চন্দননগরে মতিলাল রায়ের সাহায্যে বোমা ফাটিয়ে পরীক্ষা করা হলো তার প্রকৃতি কি হবে।

তার পর বিপ্লবী যতীন্দ্র নাথের ওপর আদেশ হলো বোমা তৈরী করার। অন্যদিকে, অতি গোপন পথে খবর সংগ্রহ করা হলো বড়লাটের শোভাযাত্রা কখন কোন্ পথ দিয়ে কিভাবে যাবে।

নির্দিষ্ট তারিখের কয়েকদিন আগেই দিল্লীতে একত্রিত হলেন নায়ক রাসবিহারী, বসন্ত বিশ্বাস এবং অবোধবিহারী। ধর্মতলায় বেরিয়ে পড়ল বড়লাটের শোভাযাত্রা। বড়লাট চলতে লাগলেন হস্তীপৃষ্ঠে উপবিষ্ট হয়ে। তাঁকে ঘিরে চলতে লাগলেন বড় বড় রাজকর্মচারীরা। চতুর্দিক থেকে তাঁদের পাহারা দিতে লাগল হাজার হাজার সশস্ত্র প্রহরী। সে দৃশ্য তন্ময় হয়ে অবলোকন করতে লাগল সারিবদ্ধ লক্ষ লক্ষ নর-নারী। দর্শকদের মধ্যে পূর্ব পরিকল্পনা মতো বিভিন্ন স্থানে দণ্ডায়মান হলেন—বিডনভার-হস্তে অবোধ বিহারী আর বোমা-হস্তে রাসবিহারী ও বসন্ত বিশ্বাস। অকস্মাৎ প্রচণ্ড শব্দে বোমা বিস্ফোরিত হলো, আর সঙ্গে সঙ্গে গুরুতর আহত হয়ে বড়লাট নীচে পড়ে গেলেন হস্তী-পৃষ্ঠ থেকে। কিন্তু সহস্র সহস্র সশস্ত্র প্রহরী প্রাণপণ চেষ্টা করেও ধরতে পারল না কাউকে।

পরদিন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল বিপ্লবীদের সুদক্ষ কর্মতৎপরতার কাহিনী আর বৃটিশ সরকারের লজ্জা জনক পরাজয়ের বৃত্তান্ত। সফল হলো বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য, যদিও বড়লাট অনেক কষ্টে বেঁচে উঠলেন শেষ পর্যন্ত।

প্রশ্ন—প্রকৃত বোমা নিক্ষেপকারী কে? বসন্ত বিশ্বাস, না, রাসবিহারী বসু?

বিচার বিশ্লেষণ করলে মনে হয় উভয়েই নিক্ষেপ করেছিলেন বোমা। কথা ছিল আগে নিক্ষেপ করবেন বসন্ত, সেটা সফল না হলে নিক্ষেপ করবেন রাসবিহারী। তাও বিফল হলে অবোধবিহারী পুলিশ কর্ডন ভেঙে ঝাঁপিয়ে পড়বেন বিডনভার নিয়ে।

এখন প্রশ্ন—সমর-কৌশলের দিক থেকে স্বয়ং সেনাপতির পক্ষে বোমা হাতে মৃত্যুর মুখে দাঁড়ানো কতটা যুক্তিসঙ্গত হয়েছিল সেদিন? রাসবিহারীর চিন্তাধারা অনুধাবন করলে খুবই যুক্তি সঙ্গত ছিল এ কাজটা। রাসবিহারী ও যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মনে করতেন গুপ্ত সংগ্রামের যুগে বৃহৎ কার্যে নেতাদেরই থাকা উচিত সংগ্রামের পুরোভাগে। তাঁরা বিশ্বাস করতেন নিপীড়িত মানবের মুক্তি সাধন করা বিধাতারই কাজ সকল কাজই সমান মহৎ সে পথে। 'আমি মরলে নেতা হবে কে?' এই নন্দলালী ভাবনা নিতান্তই হাস্যাস্পদ ছিল তাঁদের কাছে।

কোন কোন সমালোচক পার্থক্য সৃষ্টি করতে চান সশস্ত্র সংগ্রাম আর সন্ত্রাস সৃষ্টির মধ্যে। খোলা যুদ্ধকে তাঁরা বেশী গৌরবান্বিত মনে করেন সন্ত্রাস সৃষ্টির চেয়ে। কিন্তু প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই বলবেন উভয়ই এক, শুধু পার্থক্য এই যে যুদ্ধের মধ্যে কাপুরুষতা ও হিংস্রতার অবকাশ থাকে বেশী। হিরোশিমা শহরের ওপর বোমা নিক্ষেপ ছিল একান্তই সন্ত্রাস সৃষ্টি, যদিও নামে এটা ছিল মহাযুদ্ধ। অথচ কোন বীরত্বের চিহ্ন ছিল না এই নৃশংস কাজের মধ্যে। তাছাড়া আধুনিক যুদ্ধ থেকে বীরত্ব নির্বাসিত হয়েছে বহু আগেই, আর এর স্বীকৃত মূলমন্ত্র হচ্ছে—সবল তোষণ আর দুর্বল পীড়ন। এ কাজে যে যত বেশী দক্ষ তাকে বলা হয় তত বড় রাজনীতিজ্ঞ।

কিছুসংখ্যক খ্যাতিমান গান্ধীবাদী স্বদেশপ্রেমিক এই ধরণের কাজকে নিন্দা করেন হিংসাত্মক বলে। তাঁরাও যুক্তির পথে একটু গভীর ভাবে চিন্তা করলেই বুঝতে পারেন নিজেদের ভ্রান্তি। তাঁরা জানেন যে ভায়োলেন্স অর্থ বলপ্রয়োগ, হিংসা নয়, আর হিংসার ইংরেজী হেটরেড, এন্‌ভি, জেলাসি, প্রাজ, প্রভৃতি আবেগের সমন্বয়ে সৃষ্টি একটি হীন মনোবৃত্তি, ভায়োলেন্স নয়। তাঁরা বিশ্বাস করেন মুক্তি পূজারীর বলপ্রয়োগ হচ্ছে অস্ত্রোপচারী চিকিৎসকের বল প্রয়োগের মতো, আর চিকিৎসক রক্তপাত করলে বা বেদনা দিলে তাঁরা কখনও হিংসাত্মক কার্য বলেন না তাকে। তাঁরা ইতিহাসে দেখেছেন স্বেচ্ছাকৃত স্বার্থপর দুষ্টসংকল্প পাশবিক আচরণ কখনও ব্যাহত হয় না পশুশক্তির প্রাধান্য ব্যতীত। তাঁরা এটাও উপলব্ধি করছেন যে সুদীর্ঘ শুকঠোর ধ্যান সাধনা দ্বারা মনকে

অহিংস করে তুলতে না পারলে শুধুমাত্র লোক দেখানো অহিংসার অনুশীলন মানুষকে করে তোলে যেমন নীচাশয় তেমনি হিংস্র। এই হিংস্রতা ও নীচাশয়তাই প্রকাশ পায় যখন কোন কোন অহিংসবন্ধু সমালোচক সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামকে নিন্দা করে হিংসাত্মক বলে।

মহাত্মা গান্ধীর অহিংসাবাদ স্বল্পসংখ্যক লোককে প্রবুদ্ধ করেছিল নিজস্ব আত্মশক্তিতে, অগণিত লোককে প্ররোচিত করেছিল প্রচ্ছন্ন কাপুরুষতায়। কাপুরুষতা একটা চারিত্রিক ত্রুটি হলেও অপরাধ নয়, কিন্তু তাকে অহিংসা ধর্ম বলে চালানোটা একটা হীনতম অপরাধ নিঃসন্দেহে। একথা স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী স্বীকার করতেন এবং এ অপরাধের জন্য অনুশোচনা করতেন বারে বারে। ১৯৩৯ সনে গান্ধীবাদীদের পরাস্ত করে ত্রিপুরী-কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র। অহিংসাবাদীরা তখন জলতে লাগলেন সুভাষ-বিরোধী হিংসায়। শোষক-ধনীদের প্রতিনিধি গান্ধীবাদী শেঠ গোবিন্দ দাস তাঁর অভ্যর্থনা-সমিতি সভাপতির ভাষণে একবারও অভ্যর্থনা করলেন না কংগ্রেস সভাপতিকে। গান্ধীবাদী গোবিন্দবল্লভ পন্থ ভেঙে চুরমার করে ফেললেন কংগ্রেসের সংবিধানকে। সর্বোপরি স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী একটা সামান্য অজুহাতে রাজকোটে গিয়ে আমরণ অনশন শুরু করলেন ত্রিপুরী কংগ্রেসকে ম্লান করার উদ্দেশ্যে। তারপর ত্রিপুরীর অধিবেশন শেষ হলে পর অনশন সমাপ্ত করে চলে এলেন রাজকোট থেকে। নিজেদের ব্যর্থতা কারণ স্বরূপ তিনি বললেন—পাপ ছিল তাঁর মনে। স্পষ্টতঃই পাপটি ছিল সুভাষ বিরোধী হিংসা। মহাত্মা বলেই সুভাষচন্দ্র জাতির জনক বলে সম্বোধন করতেন তাঁকে। মহাত্মা বলেই তিনি মহান বলে পূজা করতেন নেতাজী সুভাষ ও রাসবিহারী বসুর মুক্তি-যজ্ঞের কর্ম-কাণ্ডকে। তিনি জানতেন রাসবিহারী আর সুভাষ উভয়েই ছিলেন সমর্পিত-প্রাণ ও উৎসর্গীকৃত-প্রাণ, উভয়েই সমাসীন ছিলেন হিংসা ও অহিংসা প্রশ্নের বহু উর্ধ্বে।

ভারতমাতার মুক্তি ভিন্ন অন্য কোন আদর্শ ছিল না রাসবিহারীর জীবনে। তিনি অনুভব করতেন বিধাতা তাঁকে পরিচালিত করছেন ভারতমাতার মুক্তি অর্জনের পথে। তার জন্য যতদিন প্রয়োজন তত দিনই বিধাতা বাঁচিয়ে রাখবেন তাঁকে। কাজেই তিনি হতে পেরেছিলেন নির্ভীক, নিঃশঙ্ক, ও পরম আশাবাদী। যেদিন বিচারক আদালতে সমস্ত বিশ্ব সেন ফাঁসির হুকুম দেন সেদিন রাসবিহারী সেখানে ছদ্মবেশে উপস্থিত হয়ে সুকৌশলে বিচারকের কাছে পাঠিয়ে দেন নিজের হাতে লেখা একটি বিবৃতি। সহকর্মীর প্রাণ রক্ষার চেষ্টায় তিনি বিচারককে লিখেছিলেন যে তিনিই সম্পূর্ণ দায়ী বসন্তের তথাকথিত অপরাধের জন্য। বিচারক চিনতেন রাসবিহারীর হস্তাক্ষর, তাই আদালতের দরজাগুলি বন্ধ করে তখনই তল্লাশি শুরু করলেন তিনি। অবশ্য ফল হয়নি কোন।

আমি বিশ্বাস করি ভারতবর্ষ এক, অখণ্ড, অবিভাজ্য।
এক আবাস, এক স্বার্থ ও এক সম্প্রীতির উপরই
জাতীর ঐক্য গঠিত। —ভগিনী নিবেদিতা।

সংবাদ সমীক্ষা

—অগ্নিদগ্ধা

এই আগষ্ট মাসের প্রথমার্দ্ধের তিনটি খবর। এমন খবর নিত্য আসে যায়। পড়িতে হয় তাই পড়ি এবং অভ্যাস দোষে ভুলিয়া যাইতে অভ্যস্ত হইয়াছি। সামনে স্বাধীনতা দিবস বলিয়াই খবর তিনটি মনের মধ্যে আনাগোনা করিতেছে— মানসিক ডিসিপ্লিনের অভাব ঘটিয়াছে মনে হয়—

১ নম্বর খবর

ধীরেন্দ্র রায়চৌধুরী নামে একটি শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বেকারকে সেদিন সকাল বেলায় দেখা গেল সপরিবারে অর্থাৎ স্ত্রী এবং দুইটি সন্তান সহ বিষপানে আত্মহত্যা করিবার চেষ্টায় অকৃত কার্য্য—(!) হইয়া টালিগঞ্জ অঞ্চলের বড় রাস্তার পার্শ্বে একটি দোকানের বারান্দায় অর্দ্ধমৃত অবস্থায় পড়িয়া আছেন। ভদ্রলোক একজন গ্র্যাজুয়েট এবং ষ্টেনোগ্রাফার। কলিকাতার কোন একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করিতেন। অজ্ঞাত কারণে তাঁহার চাকুরী যাওয়ায় তিনি বেকার হইয়া পড়েন। বাড়ী ভাড়া দিতে না পারায় ভাড়াটে বাড়ীর মালিক তাঁহাকে আবাসচ্যুত করিয়া দেয়। গত্যন্তর বিহীন হইয়া অতঃপর কিছুকাল হইতে সপরিবারে ঐ দোকানটির বারান্দায় আশ্রয় লইয়াছিলেন।

টালিগঞ্জ অঞ্চল আধুনিক রাজনৈতিক গতিশীলতা ও বৈপ্লবীক আওয়াজ তোলার অন্যতম ঘাটিকা কেন্দ্র। অধুনা ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দলের একটি নিরঙ্কুশ শক্তি কেন্দ্র। সমাজসেবী ও মানব দরদী বলিয়া যদি কেহ ইহাদের দাবী অস্বীকার করিতে সাহস করে, তবে সেই দুর্ব্বিনীত ব্যক্তির প্রাণহানি ঘটিতে পারে যে কোন মুহূর্ত্তে। কিন্তু এই শিক্ষিত বেকার ভদ্র পরিবারটির দীর্ঘকাল ব্যাপী জীবন যন্ত্রনা কাহারও সহানুভূতি অর্জন করিতে পারে নাই। দক্ষিণ কলিকাতাবাসী মুখ্যমন্ত্রীর কাণে এ খবর পৌছায় নাই, রাষ্ট্রীয় কোন সংস্থার কাছে খবরটি কেহ দয়া করিয়া দেয় নাই, কোন রাজনৈতিক নেতা বা নেতৃত্বাভিলাষী ব্যক্তিও এই তুচ্ছ ব্যাপারে মনযোগ দিতে সময় পান নাই। সুতরাং যেমন পরিণতি স্বাভাবিক ভাবেই ঘটা উচিৎ তাহাই ঘটিতেছিল। এক সকাল বেলায় আশ্রয় দাতা দোকান-দার ভদ্রলোক ব্যাপার দেখিয়া এবং তজ্জনিত নিজের ভবিষ্যৎ ফ্যাসাদ আশঙ্কা করিয়া সোর গোল তোলায় পুলিশ ঐ পরিবারটিকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে। তদবধি ইহাদের আর কোন খবর পাওয়া যায় নাই। আকাশবানী নিত্য কত ভেজাল খবর দেয়, কত কুরুচি পূর্ণ গান দিয়া নানা শ্রেণীর লোকের মনোরঞ্জন করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু এই হতভাগ্য পরিবারটির খবর লওয়া তাহারা প্রয়োজন মনে করে না।

২ নম্বর খবর

কলিকাতার একটি বহুল প্রচারিত বাংলা দৈনিকে উপরোক্ত এক নম্বর খবরটির ঠিক নীচেই যে খবরটি সেদিন ছাপা হইয়াছিল সেটি নিশ্চয়ই দেশের এই দুর্দিনের পরিপ্রেক্ষিতে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ খবর। কেলেঙ্কারী বীরেন্দ্র রায় চৌধুরী পরিবার সম্পর্কে যদিও আর কোন সাড়া-শব্দ শোনা যায় নাই তথাপি এই দুই নম্বর গুরুত্বপূর্ণ খবরটি কোন কোন সংবাদপত্রে ইতিমধ্যে দুইবার ছাপা হইয়াছে এবং আকাশবাণী কলিকাতা কেন্দ্র হইতে বার তিনেক অন্ততঃ ঘোষণা করা হইয়াছে। খবর এই যে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লকান্তি ঘোষ চিকিৎসার জন্য বিলাত যাইতেছেন। রোগ সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে কিছু বলা হয় নাই—শুধু বলা হইয়াছে পায়ের রোগ। পায়ের রোগ সত্যই বড় কঠিন রোগ এবং তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুরারোগ্য ব্যাধি হইতেছে 'পায়াভারি' রোগ। আমরা বিশেষজ্ঞ না হইলেও এইটুকু জানি যে, 'পায়াভারি' রোগের দ্বারা সাধারণতঃ আক্রান্ত হইয়া থাকেন স্বাধীন ভারতের মন্ত্রীস্থান এবং প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির প্রথম সারির নেতাগণ। আরও জানি যে, এই রোগের চিকিৎসা লণ্ডন, সুইজারল্যাণ্ড মস্কো, পিকিং প্রভৃতি স্থানে ভিন্ন সম্ভব নয়। বস্তুতঃ স্বাধীন ভারতে পদব্যাধির ভাল চিকিৎসা এখনও হয় না, কারণ এটি অত্যন্ত আধুনিক ব্যাধি—মাত্র সাতাশ বৎসর কাল এই রোগ দেখা দিয়েছে।

৩ নম্বর খবর

সুন্দরবন অঞ্চলে একটি মহিলা বাঘ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হৃদয় ঘটিত উদ্বেগের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। এই মহিলা গৃহস্থের বাড়ী চড়াও হইয়া গরু, ছাগল এবং হাঁস, মুরগী ইত্যাদি বধ করিয়াছে এবং উহাদের মাংস আহার করিয়াছে। কিন্তু মানুষ বধ করিয়াও তাহাদের মাংস আহার করে নাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বন বিভাগের একজন উচ্চ পদস্থ অফিসারকে পাঠাইয়াছেন এই মহিলা বাঘটির স্বভাব চরিত্রের খোঁজ খবর লইতে। এই অফিসারটি রাত্রিকালে সরকারী লঞ্চে বাস করিয়া তীব্র স্পট লাইটের সাহায্যে ঐ অত্যাশ্চর্য্য অরণ্য বিহারিণীর রূপ লাবণ্য দর্শন করিয়া এবং দিবা ভাগে অরণ্য সন্নিকটবর্তী বালুচরে তার পদাঙ্ক পরীক্ষা করিয়া ঐ মহিলা বাঘটির নাম দিয়াছেন 'সুন্দরী'। ভদ্রলোক সুন্দরী মহিলা চরিত্র সম্পর্কে কিছু অভিজ্ঞ সন্দেহ নাই। শোনা যায় যে, সুন্দরী গণ বধ করে, কিন্তু নিহতকে আহার করিয়া শেষ করে না। অতএব সরকারী নীতি মতে স্থির হইয়াছে যে, বাঘ 'সুন্দরী' যত ইচ্ছা মনুষ্য বধ করিতে থাকুক ক্ষতি নাই, কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত নর মাংস ভক্ষন করিবেনা ততদিন সে অবধ্য থাকিবে। মহিলাটির যাহাতে শালিনতা রক্ষিত হয় সেজন্যও নিশ্চয়ই যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

সন্দেহ নাই যে, এই ধরণের সহ্যগুণ বহন করিবার জন্য কোন ভাবে অতিরিক্ত করধার্য্যে প্রয়োজন এবস্তুই আছে। নচেৎ স্বাধীনতার মূল্য কি ?

RNI ED-2009

Regd. No. R. N.24511/71 Biplabi Bangla Regd. No. C/39

4/69

সম্পাদক মণ্ডলী : সর্বশ্রী জগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি), পরিমল মজুমদার, শান্তি সরণ রায়চৌধুরী।
প্রেস : প্রিন্টিং পাবলিসিটী, ১১৭ নং কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৯ হইতে শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক মুদ্রিত ও বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় ৪২ বঙ্কিম দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০১, (ফোন : ৩৪-১১৯৫) হইতে প্রকাশিত
সম্পাদক—বিজয় সেনগুপ্ত